তর্কভাষাপ্রকাশ, তর্কভাষাপ্রকাশিকা ও *সারমঞ্জরীর* আলোকে কেশবমিশ্রসম্মত প্রমেয় পদার্থ সমীক্ষা

পিএইচ্. ডি. উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণানিবন্ধের

সংক্ষিপ্তসার

গবেষক ঃ

বিষ্ণু চন্দ্র বর্মন

নিবন্ধনসংখ্যা ঃ A00SA1201518

তত্ত্বাবধায়ক ঃ

অধ্যাপক ড. চিন্ময় মণ্ডল

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২৩

প্রথম অধ্যায় ঃ ভূমিকা ঃ

১.০. উদ্দেশ্য ঃ জীবের দুঃখনিবৃত্তির জন্য এই ভূখণ্ডে যে সকল দার্শনিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছে, সেগুলির মধ্যে ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় অন্যতম। আর এই উভয় সম্প্রদায়কে অবলম্বন করে যে সকল প্রকরণ গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে কেশবমিশ্রের *তর্কভাষা* গ্রন্থটি ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের প্রবেশদ্বার স্বরূপ একটি অনন্যকীর্তি। গ্রন্থকার উভয় দর্শনে প্রতিপাদিত প্রমেয় পদার্থগুলি কীভাবে পূর্বপক্ষ খণ্ডনপূর্বক নিজ দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁর সেই ব্যাখ্যানশৈলী, *তর্কভাষা*বলম্বনে রচিত বিংশত্যধিক টীকার মধ্যে গোবর্ধনমিশ্রে কৃত *তর্কভাষাপ্রকাশ,* চিন্নংভট্ট কৃত *তর্কভাষাপ্রকাশিকা* ও মাধবদেব কৃত *সারমঞ্জরী* নামক টীকাত্রয়ের আলোকে তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনা করাই আলোচ্য গবেষণানিবন্ধের উদ্দেশ্য।

১.১. বিষয় নির্বাচনের তাৎপর্য ঃ

ন্যায়সম্মত প্রমেয় পদার্থ সম্পর্কিত বিবিধ প্রকার গবেষণানিবন্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেগুলিতে কেবলমাত্র মহর্ষি গৌতমোক্ত আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থই পর্যালোচিত হয়েছে। আবার একই ভাবে বৈশেষিকসম্মত দ্রব্যাদি পদার্থ বিষয়ক বিবিধ গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাওয়া যায়, যেগুলিতে কেবল বৈশেষিকসম্মত পদার্থের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা পাওয়া যায়। কিন্তু এই সমানতন্ত্রীয় দর্শন সম্প্রদায়ের প্রমেয় পদার্থগুলির একত্র অণ্বেষণ, কোন প্রকরণ গ্রন্থের টীকার আলোকে দৃষ্ট হয় না।

‘যথোত্তরং হি মুনীনাং প্রামাণ্যম্’ - এই ন্যায় অনুসারে উত্তর উত্তর মুনিদের প্রামাণ্য অধিক হওয়ায়, গ্রন্থকার অপেক্ষা টীকাকারের প্রামাণ্য অধিক। কেননা, টীকা ও টিপ্পনী অথবা ঐজাতীয় কোন ব্যাখামূলক গ্রন্থে মূলশাস্ত্রের গুঢ়-বিষয় প্রকাশিত হয়। সেজন্য কেশবমিশ্রসম্মত প্রমেয় পদার্থের পর্যালোচনায় তৎপ্রণীত *তর্কভাষা* গ্রন্থের পূর্বোক্ত তিনটি টীকা বেছে নেওয়া হয়েছে। কেশবমিশ্রের *তর্কভাষা* ও তার টীকাগুলির ওপর এরূপ গবেষণামূলক কার্য পূর্বে সম্পন্ন না হওয়ায়, সেই বিষয়টি গবেষণানিবন্ধের বিষয়রূপে নির্বাচিত করেছি।

এই গবেষণানিবন্ধের শিরোনামটি হল, ***তর্কভাষাপ্রকাশ, তর্কভাষাপ্রকাশিকা* ও *সারমঞ্জরীর* আলোকে কেশবমিশ্রসম্মত প্রমেয় পদার্থ সমীক্ষা**।

গবেষণানিবন্ধটি ছয়টি অধ্যায়ে বিভাজিত হয়েছে। সেগুলি হল -

প্রথম অধ্যায় : **ভূমিকা**।

দ্বিতীয় অধ্যায় : **ন্যায়দর্শনে প্রতিপাদিত প্রমেয় পদার্থের সামান্য পরিচয়**।

তৃতীয় অধ্যায় : **প্রমেয় পদার্থ বিষয়ে কেশবমিশ্রের অভিমত**।

চতুর্থ অধ্যায় : ***তর্কভাষা*র টীকাকারদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয়** ।

পঞ্চম অধ্যায় : ***তর্কভাষা* গ্রন্থের মর্মার্থজ্ঞাপনে *তর্কভাষাপ্রকাশ, তর্কভাষাপ্রকাশিকা* ও *সারমঞ্জরী* নামক টীকাত্রয়ের অবদান** ।

ষষ্ঠ অধ্যায় : ***তর্কভাষা*-সম্মত প্রমেয় পদার্থ নিরূপণে টীকাত্রয়ের তুলনামূলক আলোচনা**।

১.২. *তর্কভাষা* এবং *তর্কভাষা*কারের সময়কাল ও ব্যক্তিপরিচয় :

কেশবমিশ্রের *তর্কভাষা* গ্রন্থটি ন্যায়দর্শনের প্রবেশদ্বার স্বরূপ একটি অনন্যকীর্তি। গ্রন্থকার স্বয়ং এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে বলেছেন - "বালোঽপি যো ন্যায়নয়ে প্রবেশমল্পেন বাঞ্ছত্যলসঃ শ্রুতেন। সংক্ষিপ্তযুক্ত্যন্বিততর্কভাষা প্রকাশ্যতে তস্য কৃতে ময়ৈষা॥" গ্রন্থটি প্রমাণ এবং প্রমেয় ভেদে দুটি অংশে বিভক্ত। ন্যায়দর্শনের প্রথম সূত্রে উদ্ধৃত ষোড়শ পদার্থের উল্লেখপূর্বক গ্রন্থটির প্রারম্ভ হয়েছে। এরূপ গ্রন্থটির দ্বিতীয় অংশটি শুরু হয়েছে আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের উদ্দেশ কথনের দ্বারা। আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের ব্যাখ্যায় বৈশেষিকোক্ত দ্রব্যাদি পদার্থের সন্নিবেশ হওয়ায়, এটিকে উভয় দর্শনের প্রকরণগ্রন্থ বলা যায়।

কেশবমিশ্রের *তর্কভাষা* গ্রন্থটির উপর বিংশত্যধিক টীকা রচিত হয়েছে, যা গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা ও প্রসিদ্ধতার সাক্ষ্য বহন করে।

তর্কভাষা গ্রন্থটি 'ইতি কেশবমিশ্রবিরচিতা তর্কভাষা সমাপ্তা'[1] - এই বাক্যটি দিয়ে সমাপ্ত হতে দেখা যায়। এখানে 'মিশ্র' পদবী দেখে অনেকেই গ্রন্থকর্তাকে মিথিলার অধিবাসিরূপে নির্দেশ করেন। এতদ্ অতিরিক্ত তিনি নিজ পরিচয় বিষয়ে আর কিছু বলেননি। এছাড়া তাঁর অন্য কোন গ্রন্থেরও পরিচয় পাওয়া যায় না। *তর্কভাষা*র অন্যতম টীকাকার গোবর্ধনমিশ্র *তর্কভাষাপ্রকাশ*-এর মঙ্গলাচরণ অংশে নিজ পরিচয়ে একটি কারিকা লিপিবদ্ধ করেছেন। যার অর্থ এরূপ - গোবর্ধনমিশ্র হলেন কেশবমিশ্রের শিষ্য। আর তিনি বলভদ্র ও বিজয়শ্রীর পুত্র

এবং পদ্মনাভ ও বিশ্বনাথের অনুজ। জ্যেষ্ঠভ্রাতা পদ্মনাভের কাছে তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করে সুধীগণের বিনোদনের জন্য *তর্কভাষা*র ব্যাখ্যাগ্রন্থটি প্রণয়ন করেন।

কেশবমিশ্র হেত্বাভাস নামক ত্রয়োদশ পদার্থের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে উদয়নাচার্যের উল্লেখ করেছেন - "তত্র চ **উদয়নেন** 'ব্যাপ্তস্য হেতোঃ পক্ষধর্মতয়া প্রতীতি সিদ্ধিঃ, তদভাবোঽসিদ্ধিঃ' ইত্যসিদ্ধিলক্ষণমুক্তম্।"[2] উদয়নাচার্যের সময়কাল নবম শতকের শেষার্ধ থেকে দশম শতকের প্রথমার্ধ[3] বলে স্থির হয়। আচার্য বর্ধমান উপাধ্যায়, উদয়নাচার্যের কিরণাবলীর উপর *কিরণাবলীপ্রকাশ* নামে একটি টীকা রচনা করেন। বর্ধমান ত্রয়োদশ শতকের প্রথমে আবির্ভূত হন[4]। এর পরবর্তীকালে পদ্মানাভ *কিরণাবলীভাস্কর* নামে একটি টীকা রচনা করেন। অত এব এঁরা দুজনেই প্রায় সমসাময়িক। এই অনুযায়ী পদ্মনাভমিশ্রের ভাই গোবর্ধনমিশ্রেরও সময়কাল ত্রয়োদশ শতকের শেষার্ধ বলে নিশ্চিত হয়। এরূপ চিন্নংভট্ট চতুর্দশ শতকে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজা দ্বিতীয় হরিহরে পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অত এব আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, কেশবমিশ্র দ্বাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যবর্তী কোন সময়ে আবির্ভূত হন।

১.৩. প্রতিটি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

উপস্থাপিত এই গবেষণানিবন্ধটির **প্রথম অধ্যায় : 'ভূমিকা'**। এই অংশে গবেষণাকর্মের উদ্দেশ্য, বিষয় নির্বাচনের তাৎপর্য, গ্রন্থ কর্তৃত্বের পরিচয় প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। **দ্বিতীয় অধ্যায় : 'ন্যায়দর্শনে প্রতিপাদিত প্রমেয় পদার্থের সামান্য পরিচয়'**। যেহেতু সামান্যের জ্ঞান না হলে বিশেষের জ্ঞান হয় না, সেহেতু প্রথমে সামান্যরূপে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করে, তারপর আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে। এখানে আত্মাদি দ্বাদশ পদার্থবিষয়ে আচার্য বাৎস্যায়ন, উদ্দ্যোতকর, বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতি অপরাপর প্রাচীন নৈয়ায়িকদের দৃষ্টিভঙ্গী পর্যালোচনা করা হয়েছে। **তৃতীয় অধ্যায় : 'প্রমেয় পদার্থ-বিষয়ে কেশবমিশ্রের অভিমত'**। শ্রীমদ্ কেশবমিশ্র ন্যায়সম্মত প্রমেয় পদার্থের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে কীভাবে স্বাভিমত প্রতিষ্ঠা করেছেন? তা প্রদর্শন করাই হল এই অধ্যায়টির আলোচ্য বিষয়। **চতুর্থ অধ্যায় : '*তর্কভাষা*র টীকাকারদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয়'**। সংস্কৃত গ্রন্থ ও টীকা-টিপ্পনীকারগণ তাঁদের নিজ পরিচয় প্রদানে সর্বদা বিমুখ। সেজন্য, তাঁদের যথাযথ স্বরূপ উদ্ঘাটন বাস্তবিকই অত্যন্ত দুরূহ বিষয়। অন্বেষণের ফলে *তর্কভাষা*র যে সকল

টীকাকারদিগের পরিচয় সম্বন্ধে আমরা যতটুকু অবগত হতে পেরেছি, তা সংক্ষেপে এখানে বর্ণিত হয়েছে। **পঞ্চম অধ্যায় : *তর্কভাষা* গ্রন্থের মর্মার্থজ্ঞাপনে *তর্কভাষাপ্রকাশ, তর্কভাষাপ্রকাশিকা* ও *সারমঞ্জরী* নামক টীকাত্রয়ের অবদান**। টীকাকারগণ তাঁদের ব্যাখ্যানশৈলী অনুসারে *তর্কভাষা*কারোক্ত বিষয়গুলি পাঠকের কাছে কীভাবে সহজবোধ্য করে তুলেছেন, সেই বিষয়গুলি এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। যেমন - *তর্কভাষা*কার ষোড়শ পদার্থের সম্যগ্-জ্ঞানের জন্য সেগুলির উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষার কথা বলেছেন। ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার এর ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন - তত্ত্বজ্ঞান অনুমিতিস্বরূপ। পক্ষ জ্ঞানের জন্য উদ্দেশের, হেতু জ্ঞানের জন্য লক্ষণের এবং হেতুর ব্যভিচারাদি দোষ বিচারের জন্য পরীক্ষার প্রয়োজন। পক্ষ, সাধ্য ও হেতুর যথাযথ জ্ঞানের দ্বারা যেমন - সদ্ বা অসদনুমানের নিরূপণ করা যায়, সেরূপ লক্ষণরূপে কথিত হেতুর দোষবিচারের পরই আত্মাদি উদ্দেশে সেই লক্ষণের স্থাপনা করা যায়। **ষষ্ঠ অধ্যায় : *তর্কভাষা*সম্মত প্রমেয় পদার্থ নিরূপণে টীকাত্রয়ের তুলনামূলক আলোচনা**। এই অধ্যায়টিতে পূর্বপক্ষ খণ্ডনপূর্বক *তর্কভাষা*কারোক্ত প্রমেয় পদার্থগুলি টীকাত্রয়ের আলোকে তুলনামূলকভাবে পর্যালোচিত হয়েছে। যেমন - ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার 'প্রতিশরীরং ভিন্নঃ' - আত্মার এই স্বরূপটির দ্বারা 'আত্মত্ব' জাতি সিদ্ধির কথা বলেছেন। প্রতি শরীরে ভিন্ন আত্মা স্বীকৃত হলে, 'অহম্' 'অহম্' - এরূপ অনুগত প্রতীতির দ্বারা 'আত্মত্ব' জাতি সিদ্ধ হয়। তাই *তর্কভাষা*কার প্রতিটি শরীরে ভিন্ন আত্মা স্বীকারের কথা বলেছেন। কারণ, একব্যক্তিনিষ্ঠ ধর্ম জাতির বাধক। ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কারের মতে, উক্ত বিশেষণটির দ্বারা গ্রন্থকার একাত্মবাদী বেদান্তীদের খণ্ডন করেছেন। আবার ***সারমঞ্জরী***কারের মতে, আত্মা যদি একত্ববিশিষ্ট হয়, তাহলে আত্মার সুখাদি এবং বন্ধন বা মুক্তি ব্যবস্থা সম্ভব হয় না। তাই *তর্কভাষা*কার প্রতিশরীরে আত্মার ভিন্নতার কথা বলেছেন। বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, 'প্রতিশরীরং ভিন্নঃ' আত্মার এই স্বরূপ সম্বন্ধে টীকাত্রয়ে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা প্রত্যেকটি আত্মাতে প্রসক্ত হয়। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে আত্মার এতাদৃশ স্বরূপই বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থকারের এক একটি পদের দ্বারা টীকাকারগণ নিজ ব্যাখ্যান পদ্ধতিতে নিজ তন্ত্রের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার মনের অণুত্ব প্রতিপাদ প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন - মনকে বিভু স্বীকার করলে, দীর্ঘ রস-গন্ধাদি যুক্ত শষ্কুল (এক ধরনের মাছ অথবা পিষ্টক) ভক্ষণকারী পুরুষের একই সময়ে রসাদি বিবিধ বিষয়ের যুগপত্ উপলব্ধি প্রসক্ত হবে। তাই বাহ্য

ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুগপত্ অনেক বিষয়ের সম্বন্ধ হলেও যার সন্নিধানবশত ক্রমে জ্ঞান উৎপন্ন হবে, তাদৃশ সহকারিকারণকে অণুপরিমাণ স্বীকার করতে। যেমন - ন্যায়সূত্রকার যুগপত্ জ্ঞানের অনুৎপত্তিকে মনের লিঙ্গ বলেছেন। আবার ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার মধ্যম ও বিভু পরিমাণ স্বীকার করলে, যে দোষ উৎপন্ন হয়, সেগুলির কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, দেহ বা মধ্যম পরিমাণ স্বীকার করলে, মনের অনিত্যত্ব প্রসঙ্গ উপস্থিত হবে। কেননা, মধ্যম বা দেহপরিমাণ বস্তু সংকোচ ও বিকাশশালী হয়। কিন্তু মন নিরবয়ব হওয়ায় লাঘববশত নিত্য স্বীকার করতে হবে, অনিত্য স্বীকার করলে, গৌরবদোষ উপস্থিত হবে। নিজ স্বভাব অনুসারে মনের দ্বারা সমূহালম্বন জ্ঞান হলেও একই সময়ে নানা জাতীয় জ্ঞান উৎপন্ন করতে পারে না, সেজন্য মন অণুপরিমাণ। এবিষয়ে ***সারমঞ্জরী***কার বলেছেন - চক্ষুরাদির সঙ্গে মনের সংযোগবশত চাক্ষুষাদি জ্ঞানে মনের কারণত্ব স্বীকার করতে হবে, অন্যথায় চাক্ষুষ জ্ঞানের সময় স্পার্শন প্রত্যক্ষের আপত্তি উপস্থিত হবে। ফলে দর্শন ও স্পার্শনের জন্য একই ক্ষণে একই বিষয়ের জ্ঞানোৎপত্তি স্বীকার করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। কাজেই মনকে অণুপরিমাণ স্বীকার করতে হবে। এভাবে ক্রমে *তর্কভাষা*সম্মত প্রমেয় পদার্থগুলি টীকাত্রয়ের আলোকে পর্যালোচিত হয়েছে। এই ছয়টি অধ্যায়ের শেষে রয়েছে **উপসংহার**, যেখানে তুলনামূলক সমীক্ষায় উপলব্ধ বিষয়ের পর্যালোচনা এবং সেই বিষয়ে নিজ মতামত ব্যক্ত হয়েছে।

১.৪. গবেষণা কর্মের পদ্ধতি : গবেষণামূলক এই নিবন্ধটিতে *তর্কভাষাপ্রকাশ*, *তর্কভাষাপ্রকাশিকা* ও *সারমঞ্জরী* নামক টীকাত্রয়ের আলোকে কেশবমিশ্রসম্মত প্রমেয় পদার্থের সমীক্ষায় তিনটি টীকারই সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যমূলক বিশেষত্বগুলি তুলনামূলক ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সুতরাং এখানে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, তা হল 'তুলনাত্মক'।

কেশবমিশ্রসম্মত প্রমেয় পদার্থবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান এই গবেষণানিবন্ধের 'প্রয়োজন'। আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয় এবং দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থ এই নিবন্ধের প্রতিপাদ্য 'বিষয়'। উক্ত পদার্থবিষয়ে সম্যগজ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তি এই নিবন্ধের 'অধিকারী'। প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে শাস্ত্রের (এই গবেষণানিবন্ধের) প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক ভাব হল 'সম্বন্ধ'।

******

দ্বিতীয় অধ্যায় :

ন্যায়দর্শনে প্রতিপাদিত প্রমেয় পদার্থের সামান্য পরিচয়

২.০. ন্যায়দর্শনে প্রতিপাদিত প্রমেয় পদার্থগুলির স্বরূপ জানতে হলে, প্রথমে ন্যায়সম্মত পদার্থতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। কেননা, সামান্যের জ্ঞান না হলে কখনও বিশেষের জ্ঞান হতে পারে না। তাই এই অধ্যায়ের প্রথম অংশে ন্যায়দর্শনে প্রতিপাদিত পদার্থতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করে, দ্বিতীয় অংশে ন্যায় ন্যায়দর্শনে প্রতিপাদিত প্রমেয়পদার্থের সামান্য পরিচয় প্রদান করা হয়েছে।

২.১. ন্যায়দর্শনে প্রতিপাদিত পদার্থতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

মহর্ষি গৌতম প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি এবং নিগ্রহস্থান - এই ষোড়শ ভাবপদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হতে জীবাত্মার নিঃশ্রেয়স লাভের কথা বলেছেন।[5] সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থ হল ন্যায়বিদ্যার পৃথক্-প্রস্থান। সংসারে মানুষের হিতসাধনের জন্য যে চার প্রকার বিদ্যা উপদিষ্ট হয়েছে, তার মধ্যে আন্বীক্ষিকী বা ন্যায়বিদ্যা উৎকৃষ্ট। তাই বাৎস্যায়ন যথার্থই বলেছেন -

> "প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্বকর্মণাম্।
> আশ্রয়ঃ সর্বধর্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্তিতা॥"[6]

সুতরাং সংশয়াদি পদার্থ পৃথক্‌ভাবে প্রতিপাদিত না হলে, ন্যায়বিদ্যা উপনিষদ্ প্রভৃতির মত অধ্যাত্মবিদ্যারূপে গণ্য হত। তাই মহর্ষি পৃথক্-ভাবে সেই পদার্থগুলির উল্লেখ করেছেন।

২.২. আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের সামান্য পরিচয় :

শ্রীমদ্ মাধবাচার্য বলেছেন – 'প্রমায়াং যদ্ধি প্রতিভাসতে তৎপ্রমেযম্।'[7] সেজন্য ব্যাপক অর্থে প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ বস্তুমাত্রই 'প্রমেয়' অভিহিত হয়। কিন্তু মহর্ষি গৌতম জীবাত্মার মুক্তির সাক্ষাৎকারণরূপে আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয়ের কথা বলেছেন - 'আত্মশরীরেন্দ্রিয়ার্থবুদ্ধিমনঃ-প্রবৃত্তিদোষপ্রেত্যভাবফলদুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্ (ন্যা.সূ. ১.১.৯)।' অতএব 'প্রমেয়' শব্দটি এখানে পারিভাষিক অর্থে উক্ত দ্বাদশ পদার্থের জ্ঞাপক। তাই বিশ্বনাথ *ন্যায়সূত্রবৃত্তি*তে যথার্থই বলেছেন - "প্রমেয়শব্দো হি বাদাদিশব্দবত্ পরিভাষাবিশেষেণ দ্বাদশেসু প্রবর্ততে।"[8] তবে বাৎস্যায়নের মতে, উক্ত দ্বাদশ পদার্থ ব্যতিরিক্ত দ্রব্যাদি প্রমেয়পদার্থ বিদ্যমান। কিন্তু এই

দ্বাদশ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানজন্য জীবের অপবর্গ হয় এবং মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংসার হয়। সেজন্য মহর্ষি এগুলিকে বিশেষভাবে প্রতিপাদন করেছেন।

২.২.০. আত্মা : জীবাত্মা মিথ্যাজ্ঞান জন্য সংসার ভোগ করে। আবার তত্ত্বজ্ঞান জন্য অপবর্গ লাভ করে। তাই দ্বাদশ প্রমেয়ের মধ্যে আত্মা প্রধান। মহর্ষি গৌতম আত্মার স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন – 'ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নসুখদুঃখজ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গম্ (ন্যা.সূ.-১.১.১০)।' অর্থাৎ ইচ্ছাদি গুণগুলি হল আত্মার লিঙ্গ বা অনুমাপক। নব্য নৈয়ায়িক বিশ্বনাথের মতে, আত্মলক্ষণস্থিত 'লিঙ্গম্' পদটি 'লক্ষণ' অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। এবিষয়ে *ন্যায়সূত্রবৃত্তি*তে বলা হয়েছে - "অত্র চাঽত্মনঃ প্রত্যক্ষত্বাল্লিঙ্গকথনমসংগতম্...।"[9] তাই তিনি আত্মাকে হল মনোমাত্রের গোচর বলেছেন - 'অহংকারস্যাশ্রযোঽযং মনোমাত্রস্য গোচরঃ।'[10] আচার্য বাৎস্যায়নও *বৈশেষিকসূত্র* উপস্থাপনপূর্বক আত্মমনোসংযোগ দ্বারা যোগজসন্নিকর্ষজন্য আত্মার অলৌকিকপ্রত্যক্ষের কথা বলেছেন – "প্রত্যক্ষং যুঞ্জানস্য যোগসমাধিজম্ 'আত্মমনসোঃ সংযোগবিশেষাদাত্মা প্রত্যক্ষম্'(বৈ.সূ.-৯.১.১১)ইতি।"[11] কিন্তু যোগীরা যোগজসন্নিকর্ষজন্য নিজ শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মার প্রত্যক্ষ করলেও দেবদত্তাদি শরীরস্থিত আত্মা অনুমেয় পদার্থ। তাই বাৎস্যায়ন ও অন্যান্য প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ আত্মলক্ষণের ঐরূপ ব্যাখ্যা করেননি।

২.২.২. শরীর : চৈতন্যবিশিষ্ট জীবের ভোগের আধার হল শরীর। শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মারই ভোগ সম্পন্ন হয়। তাই মহর্ষি আত্মার পর তার ভোগের অধিষ্ঠান শরীরের উল্লেখ করেছেন। তিনি শরীর পদার্থের নিরূপণপ্রসঙ্গে বলেছেন – 'চেষ্টেন্দ্রিযার্থাশ্রযঃ শরীরম্ (ন্যা.সূ.-১.১.১১)।' সূত্রস্থিত 'চেষ্টা' পদটি ক্রিয়ামাত্রের বাচক হলেও অভীষ্টবস্তুর প্রাপ্তি এবং অনভীষ্টবস্তুর পরিত্যাগের নিমিত্ত যত্নবান্ ব্যক্তির ক্রিয়া হল, সেই ক্রিয়াই এখআনে চেষ্টাপদবাচ্য। বাচস্পতিমিশ্রের মতে, উক্ত **চেষ্টা** হল ব্যাপার। আর সেই ব্যাপার হল বিশিষ্টব্যাপার - "ন চ ব্যাপারমাত্রং চেষ্টা অভিমতা, অপি তু বিশিষ্টো ব্যাপারঃ।"[12]

২.২.৩. ইন্দ্রিয় : জীবাত্মার ভোগের আশ্রয় শরীর নিরূপণের পর, মহর্ষি সেই ভোগের সাধনরূপে ইন্দ্রিয়ের নিরূপণ-প্রসঙ্গে বলেছেন –'ঘ্রাণরসনচক্ষুস্ত্বকশ্রোত্রাণীন্দ্রিয়াণি ভূতেভ্যঃ (ন্যা. সূ. ১.১.১২)।' অর্থাৎ যথাক্রমে পৃথিব্যাদি পাঁচটি ভূত হতে উৎপন্ন ঘ্রাণাদি পাঁচটি পদার্থ ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত হয় এখন বক্তব্য হল - নিত্যত্ববিশিষ্ট আকাশ হতে শ্রোবণেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয় কীভাবে? বস্তুতঃ এরূপ শঙ্কা নিরর্থক। কারণ, সর্বত্র আকাশের উপলব্ধি হওয়ায়,

আকাশ সর্বব্যাপী পদার্থ। এই প্রসঙ্গে মহর্ষি বলেছেন– ‘শব্দসংযোগবিভবাচ্চ সর্বগতম্ (ন্যা.সূ. ৪.২.২১)।’ অর্থাৎ শব্দের সংযোগ এবং বিভব বা সার্বত্রিক হওয়ায় আকাশ সর্বব্যাপী। অর্থাৎ যে কোন প্রদেশে শব্দ উৎপন্ন হলে তা আকাশেই উৎপন্ন হয়। অতএব ঘটস্থিত আকাশ যেমন ঘটাকাশ, তেমনই কর্ণশষ্কুল্যবচ্ছিন্ন আকাশকে বলা হয় কর্ণাকাশ। তাই বাচস্পতিমিশ্র যথার্থই বলেছেন - ‘অত্র চ কর্ণশষ্কুলীসংযোগোপাধিনা শ্রোত্রস্য নভসঃ কথঞ্চিদ্ ভেদং বিবক্ষিত্বা ভূতেভ্য ইতি পঞ্চম্যর্থো ব্যাখ্যেয়ঃ।’[13] এই অনুসারে নব্যনৈয়ায়িক বিশ্বনাথও *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী* গ্রন্থে বলেছেন - “আকাশ একঃ সন্নপ্যুপাধেঃ কর্ণশুষ্কল্যাদের্ভেদাদ্ ভিন্নং শ্রোত্রং ভবতীত্যর্থঃ।”[14]

প্রসঙ্গতঃ বক্তব্য হল, ‘ইন্দ্রিয়’ নামক প্রমেয়ের দ্বারা মহর্ষি বাহ্যেন্দ্রিয়ের গ্রহণ করায়, সূত্রে মনের উল্লেখ করেননি। এই ধর্মভেদবশতঃ মন পৃথকভাবে বর্ণিত হয়েছে। উদ্দ্যোতকরের মতে, অভ্যুপগমসিদ্ধান্তের দ্বারা মনের ইন্দ্রিয়ত্ব সিদ্ধ হয় - “যোঽর্থঃ সূত্রেষু নোপনিবদ্ধঃ শাস্ত্রে চাভ্যুপগতঃ সোঽভ্যুপগমসিদ্ধান্ত ইতি। যথা নৈয়ায়িকানাং মন ইন্দ্রিয়মিতি।”[15]

এই বিষয়ে *ন্যায়মঞ্জরীতে* বলা হয়েছে - “তথা হি কণ্ঠোঽন্ননিগরেণ স্তনকলশালিঙ্গনাদিনা বক্ষো ভারবহনেন চাংসদ্বযমিন্দ্রিযমুচ্যতে ন কথম্?...অপি চ বিহরণমপি ন কেবলং চরণযুগলকার্যম্ অপি তু জানূরুজঙ্ঘাদিসহিতপাদসম্পাদ্যমানমপি বাহুসহিতাভ্যাং পাণিভ্যামপি নির্বর্ত্যতে ন কেবলাভ্যাম্, বাগিন্দ্রিযং তু নাভের্ব্ধে সর্বমেব স্যাদিত্যাহুঃ - ‘বায়ুর্নাভেরুত্থিত উরসি বিস্তীর্ণঃ কণ্ঠে বিবর্তিতো মূর্ধানমাহত্য পরাবৃত্তো বক্ত্রে চরন্বিবিধান্ শব্দানভিব্যনক্তি’ ইতি...।”[16]

২.২.৪. অর্থ : মহর্ষি ইন্দ্রিয়ের পর, উক্ত পঞ্চেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যবিষয় অর্থের উল্লেখ করেছেন। তিনি অর্থের স্বরূপ-প্রসঙ্গে বলেছেন – ‘গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দাঃ পৃথিব্যাদিগুণাস্তদর্থাঃ (ন্যা.সূ. ১.১.১৪)।’ অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূতের গন্ধাদি পঞ্চগুণ, যথাক্রমে ঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের অর্থ বা বিষয়। বাৎস্যায়ন বলেছেন - ‘পৃথিব্যাদীনাং যথাবিনিয়োগং গুণা ইন্দ্রিয়াণাং যথাক্রমমর্থা বিষয়া ইতি।’[17] কিন্তু উদ্দ্যোতকরের মতে, সূত্রোক্ত ‘পৃথিব্যাদি’ পদটির দ্বারা পৃথিবী, অপ্ ও তেজ এবং ‘গুণাঃ’ পদটির দ্বারা সংখ্যা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অন্যান্য গুণগুলিকেও গ্রহণ করতে হবে- ‘পৃথিব্যাদিগ্রহণেন পৃথিব্যপ্তেজাংসি

বাহ্যকরণগ্রাহ্যাণ্যপদিশ্যন্তে, গুণগ্রহণেন চ সর্বাশ্রিতো গুণা ইতি সংখ্যাপরিমাণপৃথকত্বসংযোগাঃ...।"[18] তবে বাৎস্যায়ন বা অন্যান্য নৈয়ায়িকদের মতে, মহর্ষি ঐ সূত্রের দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থমাত্রই অর্থপদবাচ্যের কথা বললেও চতুর্থ প্রমেয় 'অর্থ' বলতে তিনি গন্ধাদি পাঁচটি গুণকেই বুঝিয়েছেন। তাই বাৎস্যায়ন 'অর্থ' বলতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণমাত্রের ব্যবচ্ছেদ করতে সূত্রোল্লেখের পূর্বে 'ইমে তু...' ইত্যাদি বাক্যাংশ যোগ করেছেন। বাচস্পতিমিশ্র উক্ত উদ্ধৃতিটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন – "তু শব্দেনার্থমাত্রাদ্ ব্যবচ্ছিন্নত্তি। যেষামিন্দ্রিয়বিষয়ত্বেন ভাব্যমানানাং নিঃশ্রেয়সসাধকত্বম্, মিথ্যাজ্ঞানবিষয়ীকৃতানাং তু সংসারনিমিত্ততা, তু ইমে ইত্যর্থঃ।"[19]

২.২.৫. বুদ্ধি : মহর্ষি অর্থের পর তদ্বিষয়ক বুদ্ধি বা জ্ঞানের উল্লেখ করেছেন। এই বুদ্ধি নামক প্রমেয়ের নিরূপণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন – 'বুদ্ধিরুপলব্ধির্জ্ঞানমিত্যনর্থান্তরম্ (ন্যা.সূ. ১.১.১৫)।' অর্থাৎ বুদ্ধাদি সমানার্থবোধক শব্দগুলির দ্বারা মহর্ষি বুদ্ধির লক্ষণ নিরূপণ করেছেন। কিন্তু সাংখ্যদর্শনে বুদ্ধি, জ্ঞান, উপলব্ধি প্রভৃতি এই পর্যায়বাচক শব্দগুলি ভিন্ন অর্থে ব্যাখ্যাত হয়েছে। তাই উদ্দ্যোতকর উক্ত মতের খণ্ডন করতে বলেছেন - "ন চ পর্যায়শব্দৈঃ পদার্থানাং নানাত্বং যুক্তম, যথা ধ্বনিঃ শব্দো নাদ ইতি। অন্যথা হি ইন্দ্রঃ শক্র ইতি নানাত্বং স্যাদিতি।"[20]

২.২.৬. মন : বুদ্ধির পর মহর্ষি গৌতম অতীন্দ্রিয় বিষয়ের উপলব্ধির সাধনরূপে অন্তরিন্দ্রিয় মনের নিরূপণ প্রসঙ্গে একই সময়ে বিজাতীয় নানা জ্ঞানের অনুৎপত্তিকে মহর্ষি মনের লিঙ্গ বা অনুমাপক বলেছেন – 'যুগপজ্-জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গম্ (ন্যা.সূ. ১.১.১৬)।' অর্থাৎ যুগপদ্ জ্ঞানের অনুৎপত্তির দ্বারা মন পদার্থ অনুমিত হয়। তবে বাৎস্যায়নের মতে - স্মৃতি, অনুমান, আগম, সংশয়, প্রতিভা, স্বপ্নজ্ঞান, উহ, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা প্রভৃতিও মনের অনুমাপক – 'স্মৃত্যনুমানা-গমসংশয়প্রতিভাস্বপ্নজ্ঞানোহাঃ সুখাদিপ্রত্যক্ষমিচ্ছাদয়শ্চ মনসো লিঙ্গানি।'[21] মন স্বরূপতঃ একটি অণুপরিমাণবিশিষ্ট নিত্যপদার্থ। একই সময়ে একই ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান উৎপত্তি হয় না - এর দ্বারা যেমন মন অনুমিত হয়, সেরূপ তার একত্বও সিদ্ধ হয় - 'জ্ঞানাযৌগপদ্যাদেকং মনঃ (ন্যা.সূ. ৩.২.৫৬)।' আর এই পূর্বোক্ত হেতুটির দ্বারা মনের অণুত্বও সিদ্ধ হয়। তাই সূত্রে বলা হয়েছে - 'যথোক্তহেতুত্বাচ্চাণু (ন্যা.সূ. ৩.২.৫৯)।'

২.২.৭. প্রবৃত্তি : ‘প্রবৃত্তি’ শব্দের অর্থ হল - প্রযত্ন বা ক্রিয়া। মহর্ষি গৌতম প্রবৃত্তির লক্ষণ নিরূপণ-প্রসঙ্গে বলেছেন – ‘প্রবৃত্তির্ব্বাগ্-বুদ্ধিশরীরারম্ভঃ (ন্যা.সূ. ১.১.১৭)।’ ‘বুদ্ধি’ শব্দটি এখানে মন অর্থে গৃহীত হয়। অতএব ‘প্রবৃত্তি’ শারীরিক, বাচিক ও মানসিক - এই তিন প্রকার হয়। আচার্য বাৎস্যায়ন বলেছেন শুভকর্মের ফলে দশপ্রকার এবং অ অশুভকর্মের ফলে দশপ্রকার মোট কুড়ি প্রকার প্রবৃত্তির কথা বলেছেন।[22] কিন্তু বাচস্পতিমিশ্র, আরম্ভ বা কর্মকেই প্রবৃত্তি বলে, জ্ঞানহেতু এবং ক্রিয়াহেতুরূপে প্রবৃত্তির দুইটি ভাগের কথা বলেছেন। তার মধ্যে জ্ঞানোৎপত্তির দ্বারা যা পাপপুণ্যের হেতু হয়, তাকে বলা হয় বাক্-প্রবৃত্তি। এই বাক্-প্রবৃত্তি হল জ্ঞানজনক প্রবৃত্তি। মনের দ্বারা ইষ্টদেবতার অনুচিন্তন এবং চক্ষুরাদির দ্বারা সাধু বা অসাধু পদার্থের দর্শন প্রভৃতি ঐ বাক্-প্রবৃত্তির অন্তর্গত। এরূপ শরীরজন্য ও মনোজন্য প্রবৃত্তিকে বলা হয় ক্রিয়াজনক প্রবৃত্তি।

২.২.৮. দোষ : মহর্ষি গৌতম প্রবৃত্তি নামক পদার্থের নিরূপণের পর, সেই প্রবৃত্তি হতে উৎপন্ন দোষের উল্লেখ করেছেন। তিনি দোষের লক্ষণ-প্রসঙ্গে বলেছেন – ‘প্রবর্ত্তনালক্ষণা দোষাঃ (ন্যা.সূ. ১.১.১৯)।’ অর্থাৎ প্রবৃত্তির দ্বারা যা লক্ষ্যিত হয়, তাই দোষ। ন্যায়মতে, রাগ্, দ্বেষ ও মোহ – এই তিন প্রকার দোষের কথা বলা হয়েছে। এই রাগাদি দোষসমূহই জীবাত্মাকে পাপ ও পুণ্যকর্মে প্রবৃত্ত করে। তবে উক্ত ত্রিবিধ দোষের মধ্যে মোহই প্রধান। কারণ, মোহশূন্য ব্যক্তির রাগ ও দ্বেষ উৎপন্ন হয় না। প্রসঙ্গতঃ বক্তব্য যে, মন্বাদি শাস্ত্রে জীবের কামাদি বিবিধ দোষের কথা বলা হলেও সকল প্রকার দোষ উক্ত তিন প্রকার দোষের অন্তর্গত। তাই মহর্ষি বলেছেন – ‘তত্ ত্রৈরাশ্যং রাগদ্বেষমোহান্তর্ভাবাত্ (ন্যা. সূ. ৪.১.৩)।’

২.২.৯. প্রেত্যভাব : দোষজন্য প্রবৃত্তির ফলে জীব সংসারচক্রে আবর্তিত হয়। সেজন্য প্রবৃত্তি ও দোষের পর মহর্ষি প্রেত্যভাবের কথা বলছেন। মহর্ষি গৌতম প্রেত্যভাবের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন – ‘পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ (ন্যা.সূ. ১.১.১৯)।’ উদ্দ্যোতকর বলেছেন, সূত্রে ‘পুনঃ’ শব্দটি যে সংসারের অনাদিত্ব জ্ঞাপনের কথা বলেছেন।[23] এখন বক্তব্য হল আত্মা নিত্য, তাহলে প্রেত্যভাব কীভাবে সম্পন্ন হয়? তাই মহর্ষি বলেছেন – ‘আত্মনিত্যত্বে প্রেত্যভাবসিদ্ধিঃ (ন্যা.সূ. ৪.১.১০)।’ আত্মার এরূপ শরীর পরিগ্রহ শ্রুত্যাদিতেও বর্ণত হয়েছে। যেমন, *বৃহদারণ্যকোপনিষদে* বলা হয়েছে – তৃণাশ্রিত জোঁক যেমন একটি তৃণের প্রান্তভাগে গমন করে, প্রথমে অপর তৃণকে আশ্রয় করে শরীরের অবশিষ্ট অংশ সেখানে নিয়ে যায়, সেরূপ

এই আত্মা একটি শরীরকে অচেতনপূর্বক ত্যাগ করে, অপর শরীর আশ্রয়পূর্বক নিজেকে সেই শরীরে স্থাপন করে।[24] সুতরাং আত্মার ঐ নিত্যত্বই প্রেত্যভাব সিদ্ধির হেতু।

২.২.১০. ফল : মহর্ষি জীবের সর্ববিধ সুখদুঃখের কারণ প্রবৃত্তি ও দোষ নিরূপণের পর, সেই প্রবৃত্তি বা দোষ হতে উৎপন্ন বিষয়টিকে ফল বলেছেন– 'প্রবৃত্তিদোষজনিতোঽর্থঃ ফলম্ (ন্যা. সূ. ১.১.২০)।' প্রাচীন নৈয়ায়িকদের মতে, 'শরীর' হতে 'ফল' পর্যন্ত - এই নয়টি প্রমেয়ের বিষয় 'ফল' নামে অভিহিত হয়। যেমন, বাৎস্যায়ন বলেছেন - "সুখদুঃখসংবেদনং ফলম্। সুখবিপাকং কর্ম্ম দুঃখবিপাকঞ্চ। তৎপুনর্দ্দেহেন্দ্রিয়বিষয়বুদ্ধিষু সতীষু ভবতীতি সহ দেহাদিভিঃ ফলমভিপ্রেতম্।"[25] তবে উক্ত ফলসমূহের মধ্যে সুখদুঃখ হল মুখ্যফল এবং শরীরাদি হল গৌণফল। তাই উদ্দ্যোতকর বলেছেন – 'সোঽয়ং ফলশব্দঃ সুখদুঃখভোগে মুখ্যঃ, শরীরাদিষু গৌণ ইতি।'[26] এরূপ জয়ন্তভট্টও বলেছেন - 'অর্থগ্রহণং গৌণমুখ্যভেদপ্রদর্শনার্থম্...।'[27]

২.২.১১. দুঃখ : মুমুক্ষুর কাছে 'শরীর' হতে 'ফল' পর্যন্ত প্রমেয়গুলি দুঃখের সঙ্গে সংযোগবশতঃ দুঃখরূপে প্রতীত হবে। এই অভিপ্রায়ে মহর্ষি ফলের পর দুঃখের কথা বলেছেন – 'বাধনালক্ষণং দুঃখম্ (ন্যা. সূ. ১.১.২১)।' বাৎস্যায়ন সূত্রস্থিত 'বাধনা' শব্দটির অর্থ বলেছেন - পীড়া বা তাপ। ন্যায়শাস্ত্রে জীবের জন্মরূপ উৎপত্তিকে 'দুঃখ' নামে অভিহিত করা হয়েছে– 'বিবিধবাধনাযোগাদ্দুঃখমেব জন্মোৎপত্তি (ন্যা.সূ. ৪.১.৫৪)।' বাৎস্যায়নের মতে, জন্মমাত্রই জীব উৎকৃষ্ট, মধ্যম এবং হীন - এই তিন প্রকার দুঃখ ভোগ করে। আবার তিনি উক্ত ত্রিবিধ দুঃখের সঙ্গে 'তর' শব্দ যোগ করে, উৎকৃষ্টতর, হীনতর ইত্যাদি প্রকার দুঃখের অবান্তর ভেদ স্বীকার করেছেন -"বিবিধা চ বাধনা - হীনা, মধ্যমা, উৎকৃষ্টা চেতি। উৎকৃষ্টা নারকিণাং, তিরশ্চান্তু মধ্যমা, মনুষ্যাণাং হীনা, দেবানাং হীনতরা বীতরাগাণাঞ্চ।"[28] কিন্তু উদ্দ্যোতকর একবিংশতি প্রকার দুঃখের কথা বলেছেন।[29]

২.২.১২. অপবর্গ : দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিতে জীব চরম নিঃশ্রেয়সরূপ অপবর্গ লাভ করে। সেজন্য মহর্ষি দুঃখের পর অপবর্গের কথা বলেছেন – 'তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ (ন্যা.সূ. ১.১.২২)।' সূত্রে 'তদ্' পদটি পূর্বসূত্রোক্ত 'বাধনা' পদের বিশেষণ। অত এব সেই বাধনা বা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই হল অপবর্গ পদবাচ্য। বাৎস্যায়ন বলেছেন – 'যত্র তু নিষ্ঠা যত্র তু পর্য্যবসানং সোঽয়ং...।'[30] অর্থাৎ যেখানে জীবের সকল প্রকার দুঃখের পর্যবসান হয় এবং যেখানে জন্মমৃত্যুপ্রবাহের নিষ্ঠা বা পরিসমাপ্তি ঘটে। এই অপবর্গের নামান্তর হল নির্বানমুক্তি

বা বিদেহমুক্তি। বাৎস্যায়ন অপবর্গকে অভয়, অজর, অমৃত্যুপদ, ব্রহ্ম, ক্ষেমপ্রাপ্তি প্রভৃতি নামে অভিহিত করেছেন। ভাষ্যে বলা হয়েছে – 'তদভয়মজরমমৃত্যুপদং ব্রহ্মক্ষেমপ্রাপ্তিরিতি।'[31] জীবের সকল প্রকার কামনা-বাসনার অবসান না হলে সে কখনো মুক্তি লাভ করতে পার না। তাই জয়ন্তভট্ট বলেছেন - "যাবদাত্মগুণাঃ সর্বে নোচ্ছিন্না বাসনাদয়ঃ। তাবদাত্যন্তিকী দুঃখব্যাবৃত্তির্নাবকল্পতে॥"[32] তবে এই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি একটি নির্দিষ্ট ক্রমে হয়, যা মহর্ষি গৌতম তাঁর দ্বিতীয় সূত্রে বলেছেন - "দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরপাযাদ্ অপবর্গঃ (ন্যা.সূ. ১.১.২)।"

এভাবে ন্যায়দর্শনে উল্লিখিত আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয়পদার্থের পরিচয় সংক্ষেপে পূর্বপক্ষখণ্ডনপূর্বক আলোচিত হল।

******

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

প্রমেয় পদার্থবিষয়ে কেশবমিশ্রের অভিমত

৩.০. প্রমেয় পদার্থ বিষয়ে কেশবমিশ্রের অভিমত

কেশবমিশ্র সেখানে প্রমাণ পদার্থের নিরূপণের পর নিরূপয়িষ্যমাণ প্রমেয় পদার্থের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেছেন - "প্রমাণান্যুক্তানি, অথ প্রমেযান্যুচ্যন্তে। 'আত্মশরীরেন্দ্রিযার্থবুদ্ধিমনঃ-প্রবৃত্তিদোষপ্রেত্যভাবফলদুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেযম্' - ইতি সূত্রম্।"[33]

৩.১. জাতিঘটিত লক্ষণের দ্বারা প্রমেয় পদার্থের স্বরূপ কথন

কেশবমিশ্রের *তর্কভাষা* গ্রন্থটিতে জাতিঘটিত লক্ষণের প্রয়োগ বেশী হলেও গ্রন্থকার আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয়ের মধ্যে কেবলমাত্র **আত্মার** লক্ষণ নিরূপণপ্রসঙ্গে আত্মত্ব জাতির আশ্রয় নিয়েছেন। সেজন্য এটিকে একটি পৃথক পর্যায় ধরা হয়েছে।

● **আত্মা ঃ** *তর্কভাষা*কার 'আত্মত্ব' সামান্যের দ্বারা আত্মার লক্ষণ নিরূপণ করেছেন।[34] 'আত্মত্ব' সামান্য উভয়বিধ আত্মাতে প্রসক্ত হওয়ায়, এর দ্বারা দ্বিবিধ আত্মাকেই বুঝতে হবে। আত্মা দেহ ইন্দ্রিয়াদি হতে অতিরিক্ত, প্রতিশরীরে ভিন্ন, নিত্য ও বিভু পরিমাণ। আত্মার এতাদৃশ স্বরূপ সিদ্ধ করতে, *তর্কভাষা*কার বলেছেন - "স চ সর্বত্র কার্যোপলম্ভাদ্ বিভুঃ। পরমমহৎপরিমাণবানিত্যর্থঃ। বিভুত্বাচ্চ নিত্যোঽসৌ ব্যোমবৎ। সুখাদিনাং বৈচিত্র্যাত্ প্রতিশরীরং ভিন্নঃ।"[35] গ্রন্থকার পরিশেষ অনুমানের দ্বারা বুদ্ধ্যাদির আত্মগুণত্ব সিদ্ধ করেছেন। আর সেই অনুমানের প্রয়োগ দেখাতে গিয়ে তিনি কেবলব্যতিরেকী এবং অন্বয়ব্যতিরেকী - এই দুই প্রকার ব্যাপ্তির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

৩.২. ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের সমানতন্ত্রীয়তা প্রদর্শন

ন্যায়সম্মত দ্বাদশ প্রমেয়ের মধ্যে কেশবমিশ্র **অর্থ** নামক চতুর্থ প্রমেয়পদার্থটির নিরূপণ প্রসঙ্গে ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় সম্প্রদায়ের সমানতন্ত্রীয়তা দেখিয়েছেন। তাই এটিকে একটি পৃথক্ পর্যায় ধরা হয়েছে।

● **অর্থ ঃ** গ্রন্থকার এই অর্থ নামক চতুর্থ প্রমেয়ের স্বরূপ নিরূপণপ্রসঙ্গে বলেছেন- "অর্থা ষট্-পদার্থাঃ। তে চ দ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষসমবায়াঃ।"[36] অর্থাৎ তিনি উক্ত **অর্থ** নামক পদার্থটিতে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ এবং সমবায় - এই ছয়টি ভাবপদার্থের সন্নিবেশ

করেছেন। *তর্কভাষা*কার **অর্থ** বলতে দ্রব্যাদি সপ্তপদার্থের বর্ণনা করায় এখানে উভয় দর্শনের সমানতন্ত্রীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

*** দ্রব্য :** ন্যায় ও বৈশেষিক মতে, 'দ্রব্য' বলতে - পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিগ, আত্মা ও মন - এই নয়টি পদার্থেরই বোধ হয়। মহর্ষি কণাদ দ্রব্যের লক্ষণ করেছেন - 'ক্রিয়াগুণবৎ সমবায়িকারণমিতি দ্রব্যলক্ষণম্ (বৈ.সূ. ১.১.১৫)।' কিন্তু ক্রিয়াবত্তকে দ্রব্যের লক্ষণ বললে, আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মা - এই চারটি নিষ্ক্রিয় দ্রব্যে উক্ত লক্ষণটি অব্যাপ্ত হয়। তাই কেশবমিশ্র দ্রব্যের স্বরূপ নিরূপণপ্রসঙ্গে বলেছেন - "সমবাযিকারণং দ্রব্যম্, গুণাশ্রয় বা। তানি চ দ্রব্যাণি পৃথিব্যপ্তেজোবায়ুরাকাশকালোদিগাত্মমনাংসি নবৈব।"[37] কিন্তু ভাট্টমীমাংসকগণ, এই নয়টি দ্রব্যের সঙ্গে 'অন্ধকার' এবং 'শব্দ' নিয়ে মোট একাদশ প্রকার দ্রব্যের কথা বলেছেন। অন্ধকারকে ভাবপদার্থরূপে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু তার্কিক মতে, অন্ধকার ভাব পদার্থ নয়। অভাব পদার্থ। এই বিষয়ে বৈশেষিকসূত্রে বলা হয়েছে - 'দ্রব্যগুণকর্মনিষ্পত্তিবৈধর্ম্যাদভাবস্তমঃ (বৈ.সূ. ৫.২.১৯)।' আবার শব্দ হল গুণপদার্থ।

*** গুণ পদার্থের সামান্য পরিচয় :** কেশবমিশ্র গুণ পদার্থের লক্ষণ নিরূপণপ্রসঙ্গে বলেছেন- 'সামান্যবান্ অসমবায়িকারণমস্পন্দাত্মা গুণঃ।'[38] অর্থাৎ যে পদার্থটি সামান্য বা জাতিবিশিষ্ট, অসমবায়িকারণ এবং কর্ম হতে ভিন্ন, সেই পদার্থটি হল গুণ। এখন বক্তব্য হল, 'সত্তা' নামক জাতিটি দ্রব্য, গুণ ও কর্ম - এই তিনটি পদার্থেই বিদ্যমান। অর্থাৎ যদি কেবল 'সামান্যবান্ গুণঃ' - এরূপ বলা হয়, তাহলে লক্ষণটি দ্রব্য ও কর্মে অতিব্যাপ্ত হয়। সেই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য লক্ষণে 'অসমবায়িকারণ' ও 'অস্পন্দাত্মা' - এই দুটি পদ যুক্ত হয়েছে। কারণ, অসমবায়িকারণ সর্বদা গুণ ও কর্ম হয়। আবার 'অস্পন্দ' শব্দে কর্ম-ভিন্নের গ্রহণ হওয়ায়, এর দ্বারা গুণকে বুঝতে হবে।

এই সকল প্রকার গুণই পৃথিব্যাদি নব দ্রব্যের অন্তর্গত। এই বিষয়ে *দিনকরী*টীকায় প্রাচীন নৈয়ায়িকদের একটি প্রসিদ্ধ কারিকা উদ্ধৃত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে -

"বায়োর্নবৈকাদশ তেজসো গুণাঃ জলক্ষিতিপ্রাণভৃতাং চতুর্দশঃ।
দিক্-কালয়োঃ পঞ্চ ষড়েব চাম্বরে মহেশ্বরেঽষ্টৌ মনসস্তথৈব চ॥"[39]

*** কর্ম :** কর্ম হল চলনাত্মক ক্রিয়া যুক্ত। নব দ্রব্যের মধ্যে এটি পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও মন - এই পাঁচটি মূর্ত দ্রব্যে থাকে। কারণ, এই পাঁচটি দ্রব্য ক্রিয়াবান্। এই কর্ম পূর্বদেশের সংযোগনাশপূর্বক উত্তরদেশসংযোগের হেতু হয়। তাই *তর্কভাষা*কার কর্ম পদার্থের স্বরূপ

বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন - "চলনাত্মক কর্ম। গুণ এব দ্রব্যমাত্রবৃত্তিঃ। অবিভুদ্রব্যপরিমাণেন মূর্তত্বাপরনাম্না সহৈকার্থসমবেতং বিভাগদ্বারা পূর্বসংযোগনাশে সত্যুত্তরদেশসংযোগহেতুশ্চ।"[40] কর্মের বিভাগ প্রসঙ্গে *তর্কভাষা*কার বলেছেন - "তচ্চ উৎক্ষেপণ-অপক্ষেপণ-আকুঞ্চন-প্রসারণ-গমনভেদাত্ পঞ্চবিধম্। ভ্রমণাদয়স্তু গমনগ্রহণেনৈব গৃহ্যন্তে।"[41] অর্থাৎ ন্যায় ও বৈশেষিক মতে, ভ্রমণাদি ক্রিয়াগুলি উক্ত গমন নামক পঞ্চম কর্মের অন্তর্গত।

* **সামান্য :** ন্যায় ও বৈশেষিক আচার্যগণ 'সামান্য' শব্দটিকে 'জাতি' - এরূপ পারিভাষিক অর্থে গ্রহণ করেছেন। *তর্কভাষা*কার বলেছেন - 'অনুবৃত্তিপ্রত্যযহেতুঃ সামান্যম্।'[42] এরূপ আচার্যপ্রশস্তপাদও পর এবং অপর ভেদে দুই প্রকার সামান্যের কথা বলেছেন - 'সামান্যং দ্বিবিধং পরমপরং চানুবৃত্তিপ্রত্যয়কারণম্।'[43] আবার বিশ্বনাথ বলেছেন - 'নিত্যত্বে সতি অনেকসমবেতত্বং সামান্যম্।'[44] এই সামান্য দ্রব্য, গুণ ও কর্ম - এই তিনটি পদার্থে থাকে। এর বিভাগ বিষয়ে ন্যায় ও বৈশেষিক আচার্যদের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। যেমন- *তর্কভাষা*কার পর এবং অপররূপে সামান্যের দুই প্রকার ভেদের কথা বলেছেন।

* **বিশেষ :** *তর্কভাষা*কার বিশেষ পদার্থের স্বরূপ নিরূপণপ্রসঙ্গে বলেছেন - "বিশেষো নিত্যো নিত্যদ্রব্যবৃত্তিঃ। ব্যাবৃত্তিবুদ্ধিমাত্রহেতুঃ।"[45] অর্থাৎ বিশেষ পদার্থটি নিত্য। আর সেজন্য এটি আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা, মন এবং পৃথিব্যাদি চারটি পরমাণুরূপ নিত্য দ্রব্যবৃত্তি হয়। এই বিশেষ ভেদজ্ঞানমাত্রের হেতু বা কারণ। সাধারণত বিবিধ বস্তুর মধ্যে ভেদ জ্ঞাপন হয়, সেই বস্তুসমূহের ভেদক ধর্মের দ্বারা। যথা- গুণ, ক্রিয়া, জাতি, সংখ্যা, পরিমাণ, বিন্যাস ইত্যাদির দ্বারা। কিন্তু আকাশ ব্যতিরিক্ত নিত্যদ্রব্যে ভেদকধর্ম না থাকায়, পরস্পরের ভেদকরূপে বিশেষ পদার্থ স্বীকৃত হয়। কারণ, বিশেষ হল অন্তিম ভেদক। আর এই বিশেষের দ্বারাই ঘট বা পটে স্থিত নিত্যপরমাণুর ভিন্নতা সিদ্ধ হয়। এই প্রসঙ্গে আচার্য প্রশস্তপাদ বলেছেন - "নিত্যদ্রব্যবৃত্তযোঽন্ত্যা বিশেষাঃ। তে খল্বত্যন্তব্যাবৃত্তিহেতুত্বাদ্বিশেষা এব।"[46]

* **সমবায় :** *তর্কভাষা*কার সমবায় নামক ষষ্ঠ পদার্থের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন - "যযোর্মধ্যে একমবিনশ্যদ্ অপরাশ্রিতমেবাবতিষ্ঠতে তাবযুতসিদ্ধৌ। তদুক্তম্ - তাবেবাযুতসিদ্ধৌ দ্বৌ বিজ্ঞাতব্যৌ যযোর্দ্বযোঃ। অনশ্যদেকমপরাশ্রিতমেবাবতিষ্ঠতে॥ যথা অবযবাবযবিনৌ, গুণগুণিণৌ, ক্রিযাক্রিযাবন্তৌ, জাতিব্যক্তী, বিশেষনিত্যদ্রব্যে চেতি।"[47] অর্থাৎ অবয়ব ও অবয়বী, গুণ ও গুণী, ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান্, জাতি ও ব্যাক্তি এবং বিশেষ ও

নিত্যদ্রব্যের মধ্যে সমবায় নামক সম্বন্ধটি বিদ্যমান। এই সমবায় নিত্য পদার্থ। সেজন্য আচার্য বিশ্বনাথ সমবায়ে লক্ষণপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'সমবায়ত্বং নিত্যসম্বন্ধত্বম্।'[48]

⁕ **অভাব :** মহর্ষি কণাদ দ্রব্যাদি ষট্ পদার্থের সাধর্ম ও বৈধর্মরূপ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নিঃশ্রেয়স লাভের কথা বলেছেন। সেই অনুসারে অনেকে বৈশেষিক দার্শনিকদের ষট্-পদার্থবাদী নামে অভিহিত করেছেন। এরূপ আচার্য প্রশস্তপাদও তাঁর গ্রন্থে দ্রব্যাদি ছয়টি ভাবপদার্থেরই প্রতিপাদন করেছেন। কিন্তু *বৈশেষিকসূত্রের* নবম অধ্যায়েও অভাব পদার্থের উল্লেখ হয়েছে। সূত্রকার প্রথমে প্রতিযোগিরূপে ভাবপদার্থের কথা বলে, পরে নবম অধ্যায়ে অভাব পদার্থের কথা বলেছেন। কেননা, অভাব পদার্থের নিরূপণ প্রতিযোগিভূত পদার্থের নিরূপণাধীন।[49] তাই পরবর্তীকালে শিবাদিত্যের *সপ্তপদার্থী,* কেশবমিশ্রের *তর্কভাষা,* বিশ্বনাথের *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী,* অন্নংভট্টের *তর্কসংগ্রহ* প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে দ্রব্যাদি সাতটি পদার্থই প্রতিপাদিত হয়েছে। এই অভাব মূলতঃ দুই প্রকার - সংসর্গাভাব এবং অন্যোন্যাভাব। উক্ত সংসর্গাভাব আবার তিন প্রকার - প্রাগভাব, প্রধ্বংসাভাব এবং অত্যন্তাভাব।

প্রসঙ্গতঃ বক্তব্য হল, *তর্কভাষা*কার দ্রব্যাদি সাতটি পদার্থ নিরূপণের পর সেগুলির অস্তিত্ব প্রতিপাদন করতে, বিজ্ঞানবাদী ও ব্রহ্মবাদীদের খণ্ডন করেছেন। যেহেতু বৌদ্ধ যোগাচার সম্প্রদায় বিজ্ঞানবাদী। তাঁদের মতে, একমাত্র জ্ঞানই প্রমাণ সিদ্ধ বিষয়। এরূপ শাঙ্করদর্শনেও ব্রহ্ম ব্যতীত সকল বস্তুই মিথ্যারূপে কল্পিত হয়েছে। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক শাস্ত্রে তা স্বীকৃত হয়নি। কেননা, দ্রব্যাদি পদার্থের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়।[50]

৩.৩. প্রমেয়পদার্থ বিষয়ে কেশবমিশ্রের স্বাভিমতের সামান্য পর্যালোচনা

● **শরীর :** কেশবমিশ্র শরীর নামক প্রমেয়পদার্থের নিরূপণ প্রসঙ্গে বলেছেন - 'তস্য ভোগায়তনমন্ত্যাবয়বি শরীরম্'[51]। আচার্য বাৎস্যায়ন সামান্যভাবে আত্মার ভোগের আশ্রয়কে শরীর বলেছেন।'[52] তাহলে কেশবমিশ্রের এরূপ লক্ষণের তাৎপর্য কী? এর উত্তরে বলা হয়েছে 'অন্ত্যাবয়বী' পদটি প্রযুক্ত না হলে, হস্ত প্রভৃতি অবয়বে শরীরলক্ষণ অতিব্যাপ্ত হবে। এখন বক্তব্য হল শরীরের এরূপ লক্ষণটি পরমাণু-শরীরে অব্যাপ্ত হবে। কারণ, শাস্ত্রে পরমাত্মারূপ ঈশ্বরের শরীরকে পরমাণু-শরীররূপে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীমদ্ উদয়নাচার্য *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি* গ্রন্থে পূর্বপক্ষ খণ্ডনপূর্বক পরমাণুসমূহকে ঈশ্বরের শরীররূপে ব্যাখ্যা করেছেন। সেজন্য গ্রন্থকার উক্ত দোষ পরিহার করার জন্য শরীরের বৈকল্পিক লক্ষণ প্রদান করেছেন - 'চেষ্টাশ্রয় বা শরীরম্।'[53]

● **ইন্দ্রিয় :** *তর্কভাষা*কার ইন্দ্রিয় নামক প্রমেয়ের সামান্যলক্ষণ নিরূপণপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'শরীরসংযুক্তং জ্ঞানকরণমতীন্দ্রিম্ ইন্দ্রিযম্।'[54] অর্থাৎ যা শরীরের সঙ্গে সংযুক্ত, জ্ঞানের করণ এবং অতীন্দ্রিয়, তাই ইন্দ্রিয়। কাল প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় পদার্থে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য **জ্ঞানকরণ** পদ, ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য **শরীরসংযুক্ত** পদ এবং আলোক প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য **অতীন্দ্রিয়** পদটি লক্ষণে প্রযুক্ত হয়েছে। মহর্ষি **গৌতম** ইন্দ্রিয় নামক প্রমেয়পদার্থের নিরূপণপ্রসঙ্গে ঘ্রাণ প্রভৃতি পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের কথা বলেছেন। কিন্তু *তর্কভাষা*কার একই সঙ্গে বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয়ের উল্লেখ করেছেন।

● **বুদ্ধি :** *তর্কভাষা*কার প্রথমে ন্যায়সূত্রের অনুকরণে বুদ্ধাদি পর্যায় শব্দের দ্বারা বুদ্ধির লক্ষণ নিরূপণ করেছেন। তারপর নিজ মতে, অর্থের প্রকাশকে বুদ্ধি বলেছেন - "বুদ্ধিরুপলব্ধির্জ্ঞানং প্রত্যয ইত্যাদিভিঃ পর্যাযশব্দৈর্যাঽভিধীযতে সা বুদ্ধিঃ। অর্থপ্রকাশো বা বুদ্ধিঃ।"[55] এই বুদ্ধি মূলতঃ দুই প্রকার - অনুভব এবং স্মরণ। এই দুটি আবার যথার্থ ও অযথার্থ ভেদে দুই প্রকার। এগুলির আবার অবান্তরভেদও বিদ্যমান।

● **মন :** *তর্কভাষা*কার মন নামক প্রমেয়পদার্থের নিরূপণ প্রসঙ্গে বলেছেন - "অন্তরিন্দ্রিযং মনঃ। তচ্চোক্তমেব।"[56] গ্রন্থকার **ইন্দ্রিয়** নামক প্রমেয়পদার্থের নিরূপণপ্রসঙ্গে মনকে সুখাদি অন্তর্বিষয়োপলব্ধির সাধনরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। আবার নবম দ্রব্যরূপে মনের নিরূপণ প্রসঙ্গে মনস্ত্ব জাতির আশ্রয় নিয়েছেন। সেখানে মন একটি, নিত্য পরমাণু স্বরূপ পদার্থরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে। গ্রন্থকার 'তচ্চোক্তমেব' ইত্যাদি গ্রন্থাংশটির দ্বারা সেই বিষয়গুলিকে বুঝিয়েছেন।

● **প্রবৃত্তি :** প্রযত্ন বা ক্রিয়া বিশেষকে প্রবৃত্তি বলা হয়। *তর্কভাষা*কার এই প্রবৃত্তির স্বরূপ প্রসঙ্গে বলেছেন - 'প্রবৃত্তিঃ ধর্মাধর্মমযী যাগাদিক্রিযা, তস্যা জগৎব্যবহারসাধকত্বাৎ।'[57] অর্থাৎ প্রবৃত্তি হল ধর্ম ও অধর্মের উৎপত্তির কারণ, যাগ প্রভৃতি ক্রিয়াবিশেষ। এই প্রবৃত্তির দ্বারা জগতের সকল ব্যবহার সম্পন্ন হয়। শাস্ত্রে বিহিত এবং নিষিদ্ধ কর্মের উল্লেখ আছে। গ্রন্থকার এখানে 'আদি' পদের দ্বারা সেই সকল নিষিদ্ধ কর্মকে বুঝিয়েছেন। যাগ প্রভৃতি বিহিত বা শুভকর্মজন্য ধর্মমূলক প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। আবার নিষিদ্ধ কর্মজন্য জীবের অধর্মমূলক প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়।

● **দোষ :** জীবমাত্রে রাগ, দ্বেষ এবং মোহ - এই তিন প্রকার দোষের উদ্ভব হয়। *তর্কভাষায়* এই বিষয়ে বলা হয়েছে - "দোষাঃ রাগদ্বেষমোহাঃ। রাগ ইচ্ছা। দ্বেষো মন্যুঃ ক্রোধ ইতি যাবত্। মোহ মিথ্যাজ্ঞানং বিপর্যয ইতি যাবত্।"[58] এই তিন প্রকার দোষের মধ্যে মোহই প্রধান। কারণ, মোহশূন্য ব্যক্তির রাগ বা দ্বেষ উৎপন্ন হয় না।

● **প্রেত্যভাব :** মৃত্যুর পর জীবের পুনরায় উৎপত্তি বা জন্মগ্রহণ করা হল, প্রেত্যভাব। সেজন্য *তর্কভাষা*কার প্রেত্যভাবের স্বরূপ নিরূপণপ্রসঙ্গে বলেছেন - "পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ। স চাত্মনঃ পূর্বদেহনিবৃত্তিঃ, অপূর্বদেহসঙ্ঘাতলাভঃ।"[59] অত এব প্রেত্যভাব হল আত্মার পূর্বশরীরের পরিত্যাগ এবং অপূর্বশরীর পরিগ্রহ। গ্রন্থকার প্রাচীন নৈয়ায়িকদের সঙ্গে একই আঙ্গিকে এই দোষ ও প্রেত্যভাব নামক প্রমেয়পদার্থ দুটির ব্যাখ্যা করেছেন।

● **ফল :** ফল নামক প্রমেয়পদার্থের নিরূপণপ্রসঙ্গে *তর্কভাষা*কার জীবাত্মার স্বীয় ক্রিয়াকর্মের ভোগের কথা বলেছেন। জীব তার কর্ম অনুসারে সুখাদি ফল ভোগ করে। তাই গ্রন্থকার বলেছেন - "ফলং পুনর্ভোগঃ সুখদুঃখান্যতরসাক্ষাৎকারঃ।"[60] প্রাচীন আচার্যদের মতে, সুখ বা দুখ হল, মুখ্যফল এবং শরীরাদি প্রমেয়পদার্থগুলি হল গৌণফল। কিন্তু *তর্কভাষা*কার কেবল মুখ্য ফলের উল্লেখ করেছেন।

● **দুঃখ :** *তর্কভাষা*কার দুঃখের স্বরূপ নিরূপণপ্রসঙ্গে বলেছেন - "পীড়া দুঃখম্। তচ্চোক্তমেব" গ্রন্থকার গুণ পদার্থের ব্যাখ্যানাবসরে দুঃখকে জীবাত্মার প্রতিকূলবেদনীয় পদার্থরূপে বর্ণনা করেছেন। এখানে **তচ্চোক্তমেব** বাক্যের দ্বারা সেই বিষয়টি বুঝিয়েছেন। আচার্য **বাৎস্যায়নকে** অনুসরণ করে, ***তর্কভাষা*কারও** পীড়াকে দুঃখ বলেছেন। তবে বাৎস্যায়নোক্ত দুঃখের প্রভেদ তিনি স্বীকার করেননি। তিনি **উদ্দ্যোতকরকে** অনুসরণ করে একুশ প্রকার দুঃখ স্বীকার করেছেন। কারণ, অপবর্গের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার একুশ প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির কথা বলেছেন।

● **অপবর্গ :** *তর্কভাষা*কার মোক্ষকে অপবর্গ বলেছেন। এই অপবর্গ হল একুশ প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি - "মোক্ষোঽপবর্গঃ। স চৈকবিশতিদুঃখপ্রভেদভিন্নস্য দুঃখস্যাত্যন্তিকী নিবৃত্তিঃ।"[61] তবে 'মোক্ষ' এবং 'অপবর্গ' এগুলি পর্যায়বাচক শব্দ। *তর্কভাষা*কার পর্যায়বাচক শব্দের দ্বারা অপবর্গের লক্ষণ নিরূপণ করেছেন। ন্যায়শাস্ত্রে মহর্ষি **গৌতম** দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ এবং মিথ্যাজ্ঞানের উত্তরোত্তর অপায়ের দ্বারা জীবের অপবর্গের কথা বলেছেন। *তর্কভাষা*কার সেই বিষয়টি বিস্তৃত ভাবে বলেছেন - ন্যায়শাস্ত্রবেত্তা পুরুষ, যিনি সকল প্রকার তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করে, বিষয়সমূহের দোষ দর্শন করে, বিরক্ত হয়েছেন, সেই মুমুক্ষুকে যোগসমাধির দ্বারা একুশ প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির কথা বলেছেন। যেহেতু তার মতে, এই একুশ প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হল অপবর্গ।

******

চতুর্থ অধ্যায় :

*তর্কভাষা*র টীকাকারদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

৪.০. ন্যায়শাস্ত্রে প্রবেশের জন্য *তর্কভাষা* গ্রন্থটির অগ্রণী ভূমিকা অনস্বীকার্য। এটি ন্যায়শাস্ত্রের প্রথম পাঠার্থীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও প্রসিদ্ধ একটি গ্রন্থ। এর উপর রচিত বিংশত্যধিক টীকাগুলি গ্রন্থটির সেই জনপ্রিয়তা ও প্রসিদ্ধতার সাক্ষ্য বহন করে। *তর্কভাষা* গ্রন্থের ওপর প্রণীত টীকাগুলি হল - গোবর্ধনমিশ্রের *তর্কভাষাপ্রকাশ,* চিন্নংভট্টের *তর্কভাষাপ্রকাশিকা,* গৌরীকান্তসার্বভৌমের *তর্কভাষাপ্রকাশিকা* বা *তর্কভাষাভাবার্থদীপিকা,* বলভদ্রের *তর্কভাষাপ্রকাশিকা,* বিশ্বকর্মার *ন্যায়প্রদীপ,* কৌণ্ডিন্যদীক্ষিতের *তর্কভাষাপ্রকাশিকা,* গণেশদীক্ষিতের *তত্ত্বপ্রবোধিনী,* কেশবভট্টের *তর্কদীপিকা,* নাগেশভট্টের *যুক্তিমুক্তাবলী,* ভাস্করভট্টের *পরিভাষাদর্পণ,* মাধবদেবের *সারমঞ্জরী,* রামলিঙ্গের *ন্যায়সংগ্রহ,* দিনকরভট্টের *তর্ককৌমুদী,* বাগীশভট্টের *তর্কভাষাপ্রসাদিনী,* গোপীনাথের *উজ্জ্বলা,* অখণ্ডান্দসরস্বতীর *তর্কভাষাপ্রকাশ,* বিশ্বনাথভট্টের *ন্যায়বিলাশ* ইত্যাদি। এই টীকাগুলির পাশাপাশি কতগুলি টীকা পাওয়া যায় যেগুলির রচয়িতার নাম অজ্ঞাত। যেমন - *তর্কভাষাবার্তিক, তর্কভাষাপদকৃত্য, তর্কভাষা-ওপন্যাস* ইত্যাদি। আবার কিছু টীকাকারের নাম পাওয়া যায়, যাঁদের টীকাগুলি পাওয়া যায় না। যেমন - গুণ্ডভট্ট, মুরারিভট্ট, নারায়ণভট্ট প্রভৃতি।

৪.১. *তর্কভাষার* টীকাকারদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

সংস্কৃত গ্রন্থ ও টীকা-টিপ্পনীকারগণ তাঁদের নিজ পরিচয় প্রদানে সর্বদা বিমুখ। কেননা, এতে গ্রন্থকর্তার আত্ম-অহংকার প্রকাশ হয়। সেজন্য, তাঁদের যথাযথ স্বরূপ উদ্ঘাটন বাস্তবিকই অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। অধ্যাপক Dr. Peterson তাঁর Ulwar M.M.S.-1892-এর সূচিপুস্তকে উল্লেখ করেছেন যে, বর্ধমানের *তর্কভাষাপ্রকাশ* নামে *তর্কভাষার* একটি টীকা এবং এর উপর রুচিদত্তের উপটীকা সহ Alwar-এর মহারাজার গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়।[62] যদি আমরা এটিকে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করি, তাহলে এই অনুসারে *তর্কভাষার* প্রথম টীকাকার হলেন বর্ধমান। কিন্তু এবিষয়ে বিশদ কিছু তথ্য অন্যত্র পাওয়া যায় না, যা থেকে বর্ধমান *তর্কভাষা*র প্রথম টীকাকাররূপে সিদ্ধ হন। *তর্কভাষার* যে সকল টীকা ও টীকাকারদের পরিচয় পাওয়া যায়, নিম্নে সংক্ষেপে তার বিবরণ প্রদত্ত হল -

৪.১.১. গোবর্ধনমিশ্র : *তর্কভাষা*র প্রাচীন টীকাকারদের মধ্যে একজন হলেন গোবর্ধনমিশ্র। তাঁর রচিত টীকার নাম *তর্কভাষাপ্রকাশ*। তিনি টীকাটির প্রারম্ভে নিজ পরিচয়ে বলেছেন-

"বিজযশ্রীতনূজন্মা গোবর্ধন ইতি শ্রুতঃ।
তর্কানুভাষাযাং তনুতে বিবিচ্য গুরুনির্মিতিম্॥
বিশ্বনাথানুজপদ্মনাভানুজো গরীযান্বলভদ্রজন্মা।
তনোতি তর্কানধিগত্য সর্বান্ শ্রীপদ্মনাভাদ্বিদুষো বিনোদম্॥"[63]

অর্থাৎ গোবর্ধনমিশ্র ছিলেন বিজয়শ্রী ও বলভদ্রের পুত্র এবং বিশ্বনাথ ও পদ্মনাভের অনুজ। তিনি নিজ গুরু (কেশবমিশ্র) কৃত *তর্কভাষা*র বিস্তার ঘটিয়েছেন স্বকৃত টীকাগ্রন্থের (*তর্কভাষাপ্রকাশে*'র) দ্বারা। তিনি পূর্বজ বিদ্বান পদ্মনাভের নিকট ন্যায়শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করে (সুধীগণের) বিনোদনের কারণস্বরূপ *তর্কভাষা*র ব্যাখ্যামূলক *তর্কভাষাপ্রকাশ* নামক টীকা রচনা করেন। কিন্তু কিছু বঙ্গীয় ও হিন্দি সংস্করণে বিশ্বনাথ ও পদ্মনাভকে কেশবমিশ্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতারূপে পরিচয় দেওয়া হয়। বস্তুত তা ঠিক নয়।

পদ্মনাভ ছিলেন একজন বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞ। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর *কিরণাবলীভাস্কর* নামে একটি গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে মঙ্গলাচরণ শ্লোকে বলা হয়েছে -

"উপদিষ্টা গুরুচরণৈরস্পৃষ্টা বর্ধমানেন।
কিরণাবল্যাযামর্থাস্তন্যন্তে পদ্মনাভেন॥১॥
বিলসদ্বর্ধমানাপি তিরোহিতদিবাকরা।
সকলার্থপ্রকাশায ন ক্ষমা কিরণাবলী॥২॥
বলভদ্রমুখাম্ভোজবচনাদুদযাচলাত্।
উদিতো ভাস্করস্তস্মাদাদরেণ নিষেব্যতাম্॥৩॥"[64]

এরূপ সমাপ্তিবাক্যে তিনি নিজ পরিচয়ে বলেছেন - "ইতি শ্রীজগদ্-গুরুমিশ্রশ্রীবলভদ্রাত্মজ-বিজযশ্রীগর্ভসংভববিশ্বনাথানুজসকলশাস্ত্রারবিন্দপ্রদ্যোতনভট্টাচার্যমিশ্রশ্রীপদ্মনাভকৃতঃ কিরণা-বলীভাস্করঃ সংপূর্ণঃ।"[65] অর্থাৎ বর্ধমানের দ্বারা তাঁর *কিরণাবলীপ্রকাশে* গ্রন্থে যে বিষয়গুলি আলোচিত হয়নি, নিজ গুরু কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে পদ্মনাভমিশ্র সেই বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণ করতে উদ্যত হয়েছেন তাঁর *কিরণাবলীভাস্কর* গ্রন্থের মধ্য দিয়ে।

গোবর্ধনমিশ্র *তর্কভাষাপ্রকাশ*-এ নিজেকে বিশ্বনাথ এবং পদ্মনাভের অনুজ বলেছেন। এরূপ পদ্মনাভ আবার এখানে নিজেকে বিশ্বনাথের অনুজ বলে পরিচয় দিয়েছেন। অর্থাৎ এই অনুযায়ী নিশ্চিত হওয়া যায় যে, গোবর্ধনমিশ্র ছিলেন বলভদ্র ও বিজয়শ্রীর কণিষ্ঠপুত্র। বর্ধমান ও পদ্মনাভ প্রায় সমসাময়িক হওয়ায় গোবর্ধনের সময় ত্রয়দশ শতকের শেষার্ধ বলে নিশ্চিত হয়। গোবর্ধনমিশ্র কৃত টীকাটি ১৮৯৪ সালে এস. এম. পরাঞ্জপে মহোদয় কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়। অখণ্ডানন্দন এবং গুণরত্নগণি গোবর্ধনের এই টীকার উপর টীকা রচনা করেন। গোবর্ধন অন্য একটি রচনা হল *ন্যায়বোধিনী*। এটি অন্নংভট্টের *তর্কসংগ্রহের* প্রসিদ্ধ টীকাসমূহের মধ্যে অন্যতম।

৪.১.২. **চিন্নংভট্ট :** চিন্নংভট্ট *তর্কভাষাপ্রকাশিকা* নামে *তর্কভাষার* একটি টীকা রচনা করেন। এটি ভারতের দক্ষিণ-প্রান্তে খুবই জনপ্রিয়। চিন্নংভট্ট টীকাটিকে দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। প্রতিটি পরিচ্ছেদের সমাপ্তিবাক্যে তিনি বলেছেন - "শ্রীহরিদত্ত(হর) মহারাজপরিপালিতেন সহজসর্বজ্ঞবিষ্ণুদেবারাধ্যতনূজেন সর্বজ্ঞানুজেন চিন্নংভট্টেন বিরচিতাযাং তর্কভাষাব্যাক্রিযাযাং তর্কভাষাপ্রকাশিকাযাং প্রমেযাদিপরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।"[66] অর্থাৎ তিনি ছিলেন সর্বজ্ঞের অনুজ, বিষ্ণুদেবের পুত্র এবং সহজসর্বজ্ঞের প্রপৌত্র। তিনি বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজা হরিহরের পৃষ্ঠপোষকতায় টীকাটি রচনা করেন। বিষ্ণুদেবকে আরাধ্য বলা হয়েছে। অর্থাৎ যা থেকে অনুমিত হয় চিন্নংভট্ট একজন লিঙ্গায়ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। এখন বক্তব্য হল যে বিজয়নগর সাম্রাজ্যে দুই জন হরিহরের নাম পাওয়া যায়। প্রথম জন বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর রাজত্বকাল ১৩৩৬-১৩৫৬ খ্রিষ্টাব্দ[67]। আর দ্বিতীয় হরিহরের রাজত্বকাল ১৩৭৭-১৪০৪ খ্রিষ্টাব্দ[68]। সম্ভবত চিন্নংভট্ট দ্বিতীয় হরিহরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং ঐ সময়ই তিনি টীকাটি রচনা করেন। সেজন্য চিন্নংভট্ট চতুর্দশ শতকের দার্শনিকরূপে পরিচিত। চিন্নংভট্ট চৈতন্যভট্ট বা চেন্নুভট্ট নামেও পরিচিত ছিলেন। ১৯৩৭ সালে ভাণ্ডারকর প্রাচ্যবিদ্যাসংশোধনের তত্ত্বাবধানে ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি. কে. সাহিত্যভূষণের সম্পাদনায় টীকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

৪.১.৩. **বিশ্বকর্মা :** বিশ্বকর্মা *ন্যায়প্রদীপ* নামে *তর্কভাষার* একটি টীকা রচনা করেন। এই টীকাটির প্রারম্ভিক শ্লোকে তিনি নিজের গুরুপরিচয় প্রদান করেছেন -

"প্রণম্য বিঘ্নহন্তারং গুরুং দামোদরম্ তথা।
টীকেযং তর্কভাষাযাস্তন্যতে বিশ্বকর্মণা॥"[69]

অর্থাৎ তিনি বিঘ্ননাশের জন্য ইষ্ট দেবতা এবং নিজ গুরু দামোদরকে প্রণাম করে *ন্যায়প্রদীপ* নামে *তর্কভাষা*র টীকা রচনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। এরূপ টীকাটির সমাপ্তি শ্লোকে তিনি বলেছেন - "ইয়ং ন্যাযপ্রদীপাখ্যা টীকা শ্রীবিশ্বকর্মণা।

নির্মায বিশ্বনাথস্য পাদপদ্মে সমর্পিতা॥১॥

গ্রন্থো ন্যাযপ্রদীপাখ্যো নির্মিতো বিশ্বকর্মণা।

নির্মায খলু সঙ্খ্যাতো বাণাক্ষিরামভূমিভিঃ॥২॥"[70]

অর্থাৎ বিশ্বকর্মা স্বীয় টীকাটি সমগ্র জগতের স্বামী, তথা বিশ্বনাথের পাদপদ্মে সমর্পণ করেছিলেন। এই টীকাটি তিনি নির্মাণ করেছিলেন ১৩৩৫ শকাব্দে (বাণাক্ষিরামভূমিভিঃ)। অর্থাৎ ১৪১৩ খ্রিষ্টাব্দে। অধ্যাপক সুরেন্দ্র লাল গোস্বামী কর্তৃক ১৯০১ সালে বেনারস মেডিক্যাল হল প্রেশ হতে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

৪.১.৪. **গৌরিকান্ত ভট্টাচার্য :** গৌরিকান্ত *তর্কভাষাভাবার্থদীপিকা* নামে *তর্কভাষার* একটি টীকা রচনা করেন। এই টীকাটীর প্রারম্ভিক শ্লোকে তিনি ইষ্ট দেবতার আরাধনা করে পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বলেছেন -

"ওঁ তৎসদেভিঃ প্রতিপাদিতায নিত্যাখিলেচ্ছাকৃতিধীযুতায।

লীলাঘনশ্যামকলেবরায নমোঽস্তু তস্মৈ জগদীশ্বরায॥

উজ্জ্বলা তর্কভাষাযা ইয়ং ভাবার্থদীপিকা।

ভট্টাচার্যেণ ধীরেণ গৌরীকান্তেন তন্যতে॥২॥

মাতর্ভারতি হে শিরোমণিবচোব্যাখ্যানসৎকৌশলে

সাহঙ্কারতযৈব কেশবকৃতিব্যাখ্যাসু কিং লজ্জসে।

কর্পুরপ্রচুরোল্লসত্ খদিরযুক্তাম্বূলজো বাধরে

রাগো যাবকজোঽথবা যদি তদা কা নাম শোভাক্ষতিঃ॥৩॥"[71]

অর্থাৎ ভারতী বা স্বরসতী দেবীকে কণ্ঠে ধারণ করে তিনি স্বীয় অহংকারে কেশবকৃতি (*তর্কভাষা*'র) ব্যাখ্যা করতে উদ্যত হয়েছেন। এরূপ টীকার সমাপ্তিবাক্যে তিনি বলেছেন - 'ইতি শ্রীমহোপাধ্যাযগৌরীকান্তসার্বভৌমভট্টাচার্যবিরচিতা *ভাবার্থদীপিকা* নাম তর্কভাষাটীকা সমাপ্তিমগমত্।'[72] অর্থাৎ এ থেকে জানা যায় যে গৌরীকান্তভট্টাচার্য 'সার্বভৌম' উপাধি লাভ করেছিলেন এবং তিনি একজন বঙ্গসন্তান ছিলেন। *ভাবার্থদীপিকা* ছাড়াও *আনন্দলহরিতরি,*

তর্কভূষণটীকা, তর্কসংগ্রহটীকা নামে গৌরীকান্তের তিনটি রচনা পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধ থেকে ষোড়শ শতকের শেষার্ধের মধ্যবর্তী কোন সময়ে তিনি আবির্ভূত হন বলে মনে করা হয়[73]।

৪.১.৫. **বলভদ্র :** বলভদ্র *তর্কভাষাপ্রকাশিকা* নামে *তর্কভাষা*র একটি টীকা রচনা করেন। নিজ পরিচয়ে তিনি টীকাটির সমাপ্তি বাক্যে বলেছেন - 'ইতি শ্রীমত্-ত্রিপাঠীবিষ্ণুদাসতনুজ-বলভদ্রবিরচিতাযা তর্কভাষাপ্রকাশিকা সমাপ্তা।'[74] অর্থাৎ তিনি ছিলেন বিষ্ণুদাস ত্রিপাঠীর পুত্র। *তর্কভাষা*র টীকাকার গোবর্ধনের পিতার নাম বলভদ্র। অনেকে এই বলভদ্রকে তাঁর পিতারূপে অনুমান প্রকাশ করে। বিষয়টি প্রমাণসাপেক্ষ।

৪.১.৬. **মাধবদেব :** মাধবদেব *সারমঞ্জরী* নামে *তর্কভাষা*র একটি টীকা প্রণয়ন করেন। নিজ পরিচয়ে টীকাটির সমাপ্তি বাক্যে তিনি বলেছেন - "শ্রীধরাসুরনিবাসিমাধবদেবাত্মজ-লক্ষণদেবসূনুকাশিনিবাসিমাধবেন তর্কপ্রকাশতর্কভাষাসারমঞ্জরী বিশ্বেশ্বরপ্রীতযে চ কৃতা।"[75] অর্থাৎ মাধবদেব কাশিতে বসবাস করতেন এবং তিনি ছিলেন লক্ষণদেবের পুত্র ও গোদাবরী তীরের তথা শ্রীধরাসুরের অধিবাসী মাধবদেবের পৌত্র। তাঁর সময় কাল ১৬৮১ খ্রিষ্টাব্দ[76]। টীকাটি টী. ডী. (তোতাদ্রি দেবনায়ক) মুরলীধর কর্তৃক ১৯৮৮ সালে তিরুপতি কেন্দ্রিয় বিদ্যাপীঠে পিএইচ্. ডি. গবেষণাকর্মের বিষয়রূপে উপস্থাপিত হয়। তারপর ১৯০৯ সালে রাধাবল্লভত্রিপাঠীর তত্ত্বাবধানে সংস্কৃতবর্ষস্মৃতিগ্রন্থমালার 'অপ্রকাশিত-পাণ্ডুলিপিগ্রন্থপ্রকাশনম্-১৭'-এ তারই সম্পাদনায় এটি প্রথম বই আকারে প্রকাশিত হয়। মাধবদেবের অন্যান্য রচনাগুলি হল- *প্রমাণাদিপ্রকাশিকা, গুণরহস্যপ্রকাশ* প্রভৃতি। প্রসঙ্গত বক্তব্য হল, মাধবদেব তাঁর *সারমঞ্জরী* টীকাতে গোবর্ধনমিশ্র, গৌরীকান্তসার্বভৌম ও বলভদ্রের মত খণ্ডন করেছেন। অত এব অবশ্যই তিনি তাঁদের পরবর্তী ব্যাখ্যাকার।

৪.২. ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শনসম্মতঃ প্রকরণগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

ন্যায় ও বৈশেষিকসম্মতঃ প্রকরণ গ্রন্থগুলি উভয় দর্শন সম্প্রদায়ের বিস্তার লাভের অন্যতম কারণস্বরূপ। শাস্ত্রে প্রকরণগ্রন্থের স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হয়েছে -

"শাস্ত্রৈকদেশসম্বন্ধং শাস্ত্রকার্যান্তরে স্থিতম্।

আহু প্রকরণং নাম শাস্ত্রভেদবিচক্ষণাঃ(গ্রন্থভেদং বিপশ্চিতঃ)॥"[77]

মহামহোপাধ্যায় এস. সি. বিদ্যাভূষণ তাঁর *History of Indian Logic* গ্রন্থে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের উক্ত প্রকরণ গ্রন্থগুলিকে প্রণয়নশৈলী অনুসারে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।

৪.২.১. প্রথম শ্রেণীর প্রকরণগ্রন্থ : যেখানে প্রমাণপদার্থ মুখ্যবিষয়রূপে বর্ণনা করা হয়েছে এবং অন্যান্য পদার্থগুলিকে সেই প্রমাণপদার্থের মধ্যেই সন্নিবেশ করা হয়েছে। যেমন - ভাসর্বজ্ঞের(৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের সন্নিহিত সময়)[78] *ন্যায়সার* এই শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য প্রকরণগ্রন্থ।

৪.২.২. দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রকরণগ্রন্থ : যে গ্রন্থগুলি মূলতঃ ন্যায়দর্শনের গ্রন্থরূপে পরিচিত হলেও প্রয়োজন অনুসারে বৈশেষিকসম্মত পদার্থেরও বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন - **(ক)** বরদরাজ (১১৫০ খ্রিষ্টাব্দের সন্নিহিত সময়)[79] *তার্কিকরক্ষা* নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। **(খ)** কেশবমিশ্র (১২৭৫ খ্রিষ্টাব্দের সন্নিহিত সময়)[80] *তর্কভাষা* নামে একটি প্রকরণগ্রন্থ রচনা করেন।

৪.২.৩. তৃতীয় শ্রেণীর প্রকরণগ্রন্থ : যে গ্রন্থগুলি মূলতঃ বৈশেষিক দর্শনের গ্রন্থরূপে পরিচিত হলেও প্রয়োজন অনুসারে ন্যায়দর্শনের কতিপয় পদার্থেরও বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন - **(ক)** বল্লভাচার্য (১২০০ খ্রিষ্টাব্দের সন্নিহিত সময়)[81] *ন্যায়লীলাবতী* একটি প্রকরণগ্রন্থ রচনা করেন। **(খ)** বিশ্বনাথন্যায়পঞ্চানন(১৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ)[82] *ভাষাপরিচ্ছেদ* নামে বৈশেষিক দর্শনের একটি প্রকরণগ্রন্থ রচনা করেন। এটি *কারিকাবলী* নামেও প্রসিদ্ধ। **(গ)** জগদীশতর্কালঙ্কার(১৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দের সন্নিহিত সময়)[83] *তর্কামৃতম্* নামে বৈশেষিক দর্শনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। **(ঘ)** অন্নংভট্ট(১৭২৪ খ্রিষ্টাব্দ)[84] *তর্কসংগ্রহ* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি বৈশেষিক দর্শন সম্মত দ্রব্যাদি সপ্তপদার্থের প্রতিপাদন করেছেন। **(ঙ)** লোগাক্ষিভাস্কর(১৭০০ খ্রিষ্টাব্দ) *তর্ককৌমুদী* নামে একটি লঘুকায় প্রকরণগ্রন্থ রচনা করেছেন।

৪.২.৪. চতুর্থ শ্রেণীর প্রকরণগ্রন্থ : যে গ্রন্থগুলিতে প্রয়োজন অনুসারে ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় দর্শন শাস্ত্রের পদার্থের একত্রে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। যেমন - শশধর(১১২৫ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি)[85] *ন্যায়সিদ্ধান্তদীপ* নামে এধরণের একটি প্রকরণগ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়াও মাধবাচার্যের(১৩৩১-১৩৯১ খ্রিষ্টাব্দের সন্নিহিত সময়)[86] *সর্বদর্শনসংগ্রহ*কে এই শ্রেণীর প্রকরণগ্রন্থ বলে মনে করা হয়। প্রতিটি দার্শনিক সম্প্রদায়ের অভিপ্রায়কে গ্রন্থকার নিজ বুদ্ধিমত্তায় সংক্ষিপ্তাকারে ব্যাখ্যা করেছেন।

******

পঞ্চম অধ্যায় ঃ

তর্কভাষা গ্রন্থের মর্মার্থজ্ঞাপনে *তর্কভাষাপ্রকাশ*, *তর্কভাষাপ্রকাশিকা* ও *সারমঞ্জরী* নামক টীকাত্রয়ের অবদান

৫.০. শ্রীমদ্ কেশবমিশ্রের *তর্কভাষা* গ্রন্থাশ্রয়ে প্রণীত বিংশত্যধিক টীকা ও উপটীকাগুলির মধ্যে গোবর্ধনমিশ্র কৃত *তর্কভাষাপ্রকাশ*, চিন্নংভট্ট কৃত *তর্কভাষাপ্রকাশিকা* ও মাধবদেব কৃত *সারমঞ্জরী* নামক টীকাত্রয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'তর্কভাষাপ্রকাশ' নামক টীকাটি *তর্কভাষা*বলম্বনে রচিত টীকাগুলির মধ্যে অতি প্রাচীন। এখনও পর্যন্ত এই টীকাটিকে *তর্কভাষার* প্রথম টীকাগ্রন্থ হিসেবে ধরা হয়। বাংলা, ইংরেজী, হিন্দি, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষায় সম্পাদিত *তর্কভাষা* গ্রন্থের অনেক টীকা ও টিপ্পনীতে গোবর্ধনমিশ্রকে কেশবমিশ্রের শিষ্যরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। অত এব এই টীকাটি গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

'*তর্কভাষাপ্রকাশিকা'* নামক টীকাটিও অত্যন্ত প্রসিদ্ধ টীকা। চিন্নংভট্ট বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজা দ্বিতীয় হরিহরের পৃষ্ঠপোষকতায় এই টীকাটি রচনা করেছিলেন। গজাননশাস্ত্রী মুসলগাঁকর সম্পাদিত *তর্কভাষা* গ্রন্থের ভূমিকাতে বলা হয়েছে যে, এই টীকাটি দক্ষিণ-ভারতে খুবই জনপ্রিয়। টীকাটি সেখানে শ্রদ্ধার সঙ্গে পঠিত হয়। অত এব এই টীকাটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

'*সারমঞ্জরী'* নামক নবীন টীকাটিতে নব্য ন্যায়ের ভাষাশৈলী অনুসৃত হয়েছে। টীকাটির ব্যাখ্যাপদ্ধতি একটু ভিন্ন প্রকৃতির। এখানে কেবলমাত্র পূর্বপক্ষরূপে বৌদ্ধাদি সম্প্রদায়ের মত খণ্ডিত হয়নি। অধিকন্তু *তর্কভাষার* পূর্ববর্তী কিছু টীকাকারদের অভিমতও খণ্ডিত হয়েছে। মাধবদেব সেখানে গোবর্ধনমিশ্র, গৌরীকান্তসার্বভৌম, বলভদ্র প্রভৃতি টীকাকারদের কতিপয় বিষয় বিশ্লেষণ করে তার খণ্ডন করেছেন। অত এব সেদিক থেকে এই টীকাটিও বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

তর্কভাষা গ্রন্থের অর্থোদ্ধারে এই টীকাত্রয়ের অবদান অপরিসীম। *তর্কভাষা* গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি টীকাকারগণ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে বোধগম্য করে তোলার উত্তম প্রয়াস করে গেছেন সর্বক্ষণ। বিশ্লেষণপূর্বক সেবিষয়ক কতিপয় দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হল :-

৫.১. *তর্কভাষা* গ্রন্থের মঙ্গলাচরণশ্লোকে বলা হয়েছে - "বালোঽপি যো ন্যায়নয়ে প্রবেশমল্পেন বাঞ্ছত্যলসঃ শ্রুতেন। সংক্ষিপ্তযুক্ত্যন্বিততর্কভাষা প্রকাশ্যতে তস্য কৃতে ময়ৈষা॥"[87] অর্থাৎ যে অলস বালক স্বল্প শ্রবণ (অধ্যয়ন) করে, ন্যায়শাস্ত্রে প্রবেশে ইচ্ছা করে, তার জন্য আমার দ্বারা সংক্ষিপ্ত অথচ যুক্তি সমন্বিত *তর্কভাষা* প্রকাশিত হচ্ছে। শ্লোকস্থিত 'তস্য কৃতে' পদের 'কৃতে' অব্যয়টি যে 'তাদর্থে' প্রযুক্ত হয়েছে, তা বোঝাতে ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার কাব্য ও ব্যাকরণ উভয়ের যুক্তি দিয়েছেন। যেমন - *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*তে এবিষয়ে জিজ্ঞাসাপূর্বক বলা হয়েছে - "কস্মৈ প্রকাশ্যতে? ইত্যত আহ - তস্য কৃতে ইতি। কৃতে ইত্যব্যয়ং তাদর্থ্যে। কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে, ইত্যত্র সাংধিবিহগ্রহকে কৃতম্ ইত্যেতত্তথা ব্যাখ্যাতম্। যদ্বা ক্রিয়ত ইতি কৃচ্ছব্দঃ ক্বিবন্তঃ কর্মণি নিষ্পন্নঃ প্রয়োজনবচনঃ। তথা চ তস্য কৃত ইতি তদর্থমিত্যর্থঃ।"[88]

এরূপ 'ন্যায়নয়' পদটির অর্থ বোঝাতে, ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার দুই প্রকার ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন। 'নীয়তে জ্ঞাপ্যতে বিবক্ষিতোঽর্থো যেনেতি' - অর্থাৎ যার দ্বারা বাদীর বিবক্ষিত অর্থ জানা যায় - এরূপ ব্যুৎপত্তির দ্বারা উৎপন্ন 'ন্যায়' বলতে, পঞ্চাবয়ব বাক্যযুক্ত অনুমানকে বোঝায়। আবার 'নীয়তে প্রতিপাদ্যতে অনেন'- এরূপ ব্যুপত্তির দ্বারা উৎপন্ন 'ন্যায়' শব্দ ন্যায়শাস্ত্রকে বোঝায়। এবিষয়ে *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*তে বলা হয়েছে - "কুত্রেত্যপেক্ষায়াং কথয়তি - ন্যায়নয় ইতি। নীয়তে জ্ঞাপ্যতে বিবক্ষিতোঽর্থো যেনেতি করণব্যুৎপত্ত্যা ন্যায়োঽনুমানম্। অত এবোক্তং ভাসর্বজ্ঞেনানুমাননিরূপণাবসানে - 'সোঽয়ং পরমো ন্যায়ঃ' ইতি। নীয়তে প্রতিপাদ্যতে অনেন ন্যায় ইতি নয়শব্দঃ শাস্ত্রবচনঃ। ন্যায়নয়ো ন্যায়শাস্ত্রম্।"[89] প্রসঙ্গত বক্তব্য যে টীকাকার এখানে ভাসর্বজ্ঞের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ভাসর্বজ্ঞ পঞ্চাবয়বযুক্ত পরার্থানুমান বাক্যকে 'পরমন্যায়' বলেছেন। তবে এক্ষেত্রে ভাসর্বজ্ঞ *ন্যায়ভাষ্য*কারকে অনুসরণ করে কথাটি বলেছেন। কারণ, আমরা এর উল্লেখ *ন্যায়ভাষ্যে* প্রথম পাই।[90] তবে সে যাই হোক, পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা হতে আমরা এই স্থলে প্রযুক্ত 'ন্যায়নয়' শব্দের অর্থ বুঝতে পারি।

৫.২. *তর্কভাষা*কার ন্যায়দর্শনের প্রথম সূত্রের উল্লেখপূর্বক গ্রন্থের আরম্ভ করেছেন। সেখানে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থতত্ত্বের জ্ঞান হতে নিঃশ্রেয়স লাভের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ঐ ষোড়শ পদার্থতত্ত্বের সম্যগ্‌জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান ততক্ষণ পর্যন্ত হয় না, যতক্ষণ না এদের উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা করা হয়। তাই তিনি *ন্যায়ভাষ্য*কারকে অনুসরণ করে শাস্ত্রের ত্রিবিধ প্রবৃত্তির কথা বলেছেন - 'যদাহ ভাষ্যকার - ত্রিবিধা চাস্য শাস্ত্রস্য প্রবৃত্তিরুদ্দেশলক্ষণং পরীক্ষা চেতি।'[91] ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার এই বিষয়টি ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন - "তত্ত্বজ্ঞানমিহেতরভিন্নত্বেন

জ্ঞানমনুমিতিরূপম্। তত্র চ পক্ষজ্ঞানার্থমুদ্দেশস্য হেতুজ্ঞানার্থং লক্ষণস্য হেতৌ ব্যভিচারাদিপরিহারার্থং পরীক্ষায়া উপযোগ ইতি ন প্রথমসূত্রমাত্রেণ তত্-সিদ্ধিরিতি ভাবঃ।"[92] তত্ত্বজ্ঞান ইতর ভিন্ন। অর্থাৎ অন্য সকল জ্ঞান হতে ভিন্ন ভাবে উৎপন্ন হওয়ায়, এটি অনুমিতিস্বরূপ। এক্ষেত্রে অনুমানের আকার হল 'তত্ত্বজ্ঞানমনুমিতিরূপং স্বেতরভিন্নত্বাত্'। তাই কেবলমাত্র প্রথম ন্যায় সূত্রের দ্বারা তা লাভ করা যায় না। উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারাই লাভ করা যায়। সেখানে পক্ষ জ্ঞানের জন্য উদ্দেশের, হেতু জ্ঞানের জন্য লক্ষণের এবং হেতুর ব্যভিচারাদি দোষ বিচারের জন্য পরীক্ষার প্রয়োজন। অত এব পক্ষ, সাধ্য ও হেতুর যথাযথ জ্ঞানের দ্বারা যেমন - সদ্ বা অসদনুমানের নিরূপণ করা যায়। সেরূপ - লক্ষণরূপে কথিত হেতুর দোষ বিচারের পরই আত্মাদি উদ্দেশে সেই লক্ষণের স্থাপনা করা যায়। শাস্ত্রের ত্রিবিধ প্রবৃত্তি বোঝাতে টীকাকার এখানে যে, পক্ষ, হেতুর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তা প্রশংসনীয়।

৫.৩. ***সারমঞ্জরী***কার *তর্কভাষাপ্রকাশ*কারের কথিত পূর্বোক্ত বিষয়টিকে আর একটু ব্যাখ্যা করে বলেছেন - "অত্রেতরভেদানুমিতৌ উদ্দেশস্য পক্ষজ্ঞানবিধয়া লক্ষণস্য হেতুজ্ঞানবিধয়া পরীক্ষায়াঃ ব্যাপ্তিগ্রাহকতযোপযোগঃ। লক্ষণবাক্যপ্রবিষ্টলক্ষ্যসমর্পকপদেনৈব পক্ষজ্ঞানসংভবাত্ ন্যুনাধিক সংখ্যাব্যবচ্ছেদস্য পরীক্ষাবাক্যেনৈব, পৃথিব্যাদিলক্ষণাতিব্যাপ্তিনিরাসেন ন্যুনসংখ্যাব্যবচ্ছেদেন অব্যাপ্তিনিরাসেনাধিকসংখ্যাব্যবচ্ছেদেন জাতত্বাত্ পার্থক্যেন উদ্দেশাত্মকশাস্ত্রপ্রয়োজনং মৃগ্যম্।"[93] অর্থাৎ সেখানে পক্ষ জ্ঞানের জন্য উদ্দেশের, হেতু জ্ঞানের জন্য লক্ষণের এবং ব্যাপ্তিগ্রহের জন্য পরীক্ষার উপযোগ হয়। লক্ষণ-বাক্যে প্রবিষ্ট লক্ষণঘটক পদের দ্বারা পক্ষজ্ঞান (লক্ষ্য বস্তুর জ্ঞান) সম্ভব হওয়ায়, ন্যূন ও অধিক সংখ্যা ব্যবচ্ছেদের জন্য পরীক্ষা-বাক্যের প্রয়োজন। পৃথিব্যাদি লক্ষণে ন্যূন সংখ্যা ব্যবচ্ছেদের দ্বারা অব্যাপ্তি নিরাস হয় এবং অধিক সংখ্যা ব্যবচ্ছেদের দ্বারা অতিব্যাপ্তির নিরাস হয়। তাই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হওয়ায়, উদ্দেশাত্মক শাস্ত্রের (উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষার) প্রয়োজন। প্রসঙ্গত বক্তব্য যে, *সারমঞ্জরী*তে এরূপ বহুবিধ দৃষ্টান্ত আছে, যেখানে তিনি কেবল গ্রন্থকারোক্ত বিষয় নয়, তার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে পূর্ববর্তী টীকাকারের দ্বারা কথিত বিষয়েরও বিশ্লেষণ করেছেন।

৫.৪. 'সাধক' ও 'কারণ' পর্যায়বাচক শব্দ হওয়ায়, *তর্কভাষা*কার 'কারণ' বিষয়ে যথার্থ বোধ উপপত্তির জন্য 'অনন্যথাসিদ্ধ নিয়ত পূর্ববৃত্তিত্ব'কে কারণ বলেছেন। যেমন - পট কার্যের প্রতি তন্তু, তুরি, বেমা প্রভৃতি। যদিও পটের উৎপত্তি ক্ষণে দৈববশত **রাসভাদি**র উপস্থিতি লক্ষ্য

করা যায়, কিন্তু তা নিয়ত নয়। আবার তন্তুর প্রতি **তন্তুরূপের** নিয়ত পূর্ববৃত্তিত্ব থাকলেও তা অন্যথাসিদ্ধ। যেহেতু পটরূপ উৎপন্ন করার পর তন্তুরূপ বিনষ্ট হয়। তাই পুনরায় তার কারণত্ব স্বীকার করলে কল্পনাগৌরব দোষ হয়। সেজন্য অনন্যথাসিদ্ধ নিয়ত পূর্ববৃত্তিত্ব হল কারণ এবং পশ্চাৎ বৃত্তিত্ব হল কার্য। এখন বক্তব্য হল, এই অন্যথাসিদ্ধ কী? এবং এটি কত প্রকার? ইত্যাদি বিষয় সম্যগ্ ভাবে না জানলে, কারণ-বিষয়ে যথার্থ বোধ উৎপন্ন হয় না। তাই *তর্কভাষাপ্রকাশ*কার এই প্রসঙ্গে অন্যথাসিদ্ধ ও তার পাঁচ প্রকার ভেদের কথা বলেছেন। 'অন্যথা' শব্দের অর্থ হল অন্যভাবে (অন্যেন প্রকারেণ) অর্থাৎ যা নিয়তপূর্ববর্তিভিন্নরূপে সিদ্ধ, তাই অন্যথাসিদ্ধ। গ্রন্থকার কথিত পূর্বোক্ত উদাহরণে রাসভাদি হল পঞ্চম এবং তন্তুরূপ হল দ্বিতীয় অন্যথাসিদ্ধ। সেখানে অপর অন্যথাসিদ্ধগুলি হল - প্রথম অন্যথাসিদ্ধ : যে কার্যের প্রতি কারণের পূর্ববর্তিতা যে রূপ বা ধর্মের দ্বারা গৃহীত হয়, সেই কার্যের প্রতি সেই রূপ বা ধর্ম প্রথম অন্যথাসিদ্ধ হয়। যেমন - ঘটকার্যের প্রতি দণ্ডত্ব। দ্বিতীয় অন্যথাসিদ্ধ : যে কার্যের সঙ্গে যে পদার্থটির অন্বয়ব্যতিরেক সম্বন্ধ থাকে না, কিন্তু নিজ কারণকে অপেক্ষা করে, অন্বয়-ব্যতিরেক জ্ঞান হয়, সেই পদার্থটি হল দ্বিতীয় অন্যথাসিদ্ধ। যেমন - ঘটকার্যের প্রতি দণ্ডরূপ। তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধ : অন্য কোন পদার্থের প্রতি পূর্ববর্তিতা সিদ্ধ হলে, যে পদার্থটি কোন কার্যের প্রতি পূর্ববর্তিতা গৃহীত হয়, সেই পদার্থটি তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধ হয়। যেমন - ঘটকার্যের প্রতি আকাশ। চতুর্থ অন্যথাসিদ্ধ : যে পদার্থটি প্রথমে কার্য জনকের পূর্ববর্তিরূপে জ্ঞাত হয়ে, পরে কার্যের পূর্ববর্তিতারূপে জ্ঞাত হয়, সেটি চতুর্থ অন্যথাসিদ্ধ হয়। যেমন - ঘটকার্যের প্রতি কুলালপিতা। পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধ : যে পদার্থটি কার্যোৎপত্তির নিয়ত পূর্ববর্তী, সেই নিয়ত পূর্ববর্তী পদার্থ ভিন্ন যাবতীয় পদার্থ পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধরূপে জ্ঞাত হয়। যেমন - ঘটোৎপত্তির প্রতি রাসভাদি। এভাবে ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার উক্ত পঞ্চ অন্যথাসিদ্ধের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে শেষে কারণপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'এতদন্যথাসিদ্ধিপঞ্চকরাহিত্যে সতি নিযতপূর্ববর্ত্তিত্বমেব কারণত্বম্।'[94] অত এব গ্রন্থে পাঁচ প্রকার অন্যথাসিদ্ধের বর্ণনা না থাকায়, *তর্কভাষাপ্রকাশ*কারের এরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা পাঠকের কারণ ও পাঁচ প্রকার অন্যথাসিদ্ধ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান হয়।

******

ষষ্ঠ অধ্যায় :

*তর্কভাষা*সম্মত প্রমেয় পদার্থ নিরূপণে টীকাত্রয়ের তুলনামূলক আলোচনা

৬.০. আলোচ্য অধ্যায়টিতে গবেষণাকর্মের মুখ্যবিষয়টি পর্যালোচিত হয়েছে। শ্রীমদ্ কেশবমিশ্র তাঁর *তর্কভাষা* গ্রন্থটিতে কীভাবে ন্যায়সম্মত প্রমেয় পদার্থগুলি নিজ দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে ব্যাখ্যা করে, স্বাভিমত প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেই বিষয়গুলি গোবর্ধনমিশ্রের *তর্কভাষাপ্রকাশ*, চিন্নংভট্টের *তর্কভাষাপ্রকাশিকা* ও মাধবদেবের *সারমঞ্জরী* নামক টীকাত্রয়ের আলোকে তুলনামূলকভাবে এই অধ্যায়ে পর্যালোচিত হয়েছে।

৬.১. আত্মা : *তর্কভাষা*কার আত্মত্ব সামান্যের দ্বারা 'আত্মা' নামক প্রমেয় পদার্থের লক্ষণ নিরূপণ করেছেন। এই আত্মা স্বরূপত **শরীরেন্দ্রিয়াদি হতে ব্যতিরিক্ত**, **প্রতি শরীরে ভিন্ন**, **নিত্য, বিভু** এবং **মানসপ্রত্যক্ষগম্য**। *তর্কভাষা*কার আত্মার লক্ষণ নিরূপণের পর তার এতাদৃশ স্বরূপগুলি প্রতিপাদন করেছেন। আত্মার এই লক্ষণ-বিচার ও স্বরূপ-নিরূপণ বিষয়ে টীকাত্রয়ে যে বিশেষত্বগুলি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তা হল –

'প্রতিশরীরং ভিন্নঃ' - আত্মার এই স্বরূপটির দ্বারা ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার আত্মত্ব জাতি সিদ্ধির কথা বলেছেন। কিন্তু ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কারের মতে, গ্রন্থকার উক্ত বিশেষণটির দ্বারা একাত্মবাদীদের খণ্ডন করেছেন। কেননা, আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ অনুসারে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, অন্য সকল জাগতিক বিষয় মিথ্যা। আবার চেতন পদার্থ এবং অচৈতন্য বিশিষ্ট ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজসম্প্রদায়ের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু ন্যায় ও বৈশেষিক মতে, তা স্বীকৃত হয়নি। তাই ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কারের মতে, গ্রন্থকার পূর্বোক্ত বিশেষণটির দ্বারা একাত্মবাদী বেদান্তীদের অভিমত খণ্ডন করেছেন। এবিষয়ে *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*তে বলা হয়েছে - "ব্রহ্মৈব তাবত্ স্বাবিদ্যযা সংসরতি স্ববিদ্যযা মুচ্যতে অবিদ্যোপহিতং ব্রহ্মৈব জীবরূপং ব্যপদিশ্যতে। ততশ্চ জীবব্রহ্মণোর্ঘটাকাশমঠাকাশবজ্জীবানাং ঘটাকাশমঠাকাশবৎ পরস্পরং ভেদাভাবাদাত্মৈকত্বং বদতামেকমেবাদ্বিতীযং ব্রহ্মেত্যাদিবচননিচযং প্রমাণীকুর্বতাং বেদান্তিনাং মতমপাকর্তুমাহ- প্রতিশরীরমিতি।"[95] আবার ***সারমঞ্জরী***কারের মতে, আত্মা যদি একত্ববিশিষ্ট হয়, তাহলে আত্মার সুখাদি এবং বন্ধন বা মুক্তি ব্যবস্থা সম্ভব হয় না। তাই প্রতি শরীরে আত্মার ভিন্নতার কথা বলা হয়েছে। এই বিষয়ে

*সারমঞ্জরী*তে বলা হয়েছে - "সর্বশরীরবৃত্ত্যাত্মন একত্বে সুখদুঃখাদিব্যবস্থা বদ্ধমুক্তব্যবস্থা ন স্যাত্। অতঃ প্রতিশরীরং ভিন্নঃ।"[96]

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে আত্মার বিভুত্ব স্বীকৃত হয়েছে। সেজন্য ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার অণু ও মধ্যমপরিমাণে দোষ দেখিয়ে, শেষে আত্মার বিভুত্ব প্রতিপাদন করেছেন। কারণ, আত্মাকে যদি আমরা অণুপরিমাণ স্বীকার করি, তাহলে তার অতীন্দ্রিয়ত্ব প্রসঙ্গ আসবে। কেননা, অণুপরিমাণবিশিষ্ট পদার্থ সর্বদা অতীন্দ্রিয় হয়। এরূপ যদি মধ্যম বা দেহপরিমাণ স্বীকার করি, তাহলে পরমাণু, দ্ব্যণুক, ত্রসরেণু প্রভৃতি কল্পনা-গৌরব দোষ উপস্থিত হবে। আবার মধ্যম বা দেহপরিমাণবিশিষ্ট পদার্থ সাবয়বযুক্ত হওয়ায়, আত্মাতে অনিত্যত্বও প্রসক্ত হবে। কাজেই আত্মাকে পরমমহৎ বা বিভু পরিমাণ পদার্থরূপে স্বীকার করতে হবে। এবিষয়ে *তর্কভাষাপ্রকাশে* বলা হয়েছে - 'অণুপরিমাণত্বে চাতীন্দ্রিয়ত্বং মধ্যমপরিমাণত্বে পরমাণ্বাদিকল্পনাযাং গৌরবং স্যাদিতি মহাপরিমাণ ইতি ভাবঃ।'[97] এভাবে বিভুত্ব প্রতিপাদনের পর টীকাকার আত্মার ঐ বিভুত্ব ধর্মটিকে শরীর, ইন্দ্রিয়াদি হতে অতিরিক্তত্বের হেতুরূপে উল্লেখ করেছেন - "দেহাদিব্যতিরিক্তত্বে হেতুমাহ। **বিভুরিতি**।"[98]

তর্কভাষাপ্রকাশিকাকারের মতে, *তর্কভাষা*কার আত্মার **বিভুত্ব** প্রতিপাদন করায়, অণু ও মধ্যমপরিমাণবাদী, রামানুজ ও জৈন সম্প্রদায়ের অভিমত খণ্ডিত হয়েছে। এবিষয়ে *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*তে বলা হয়েছে - "অনুপরিমাণ আত্মেতি রামানুজমতানুসারিণঃ সংগিরন্তে। উপসংহরন্তি চ। 'বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় স চানন্ত্যায় কল্পতে॥' ইতি। প্রদীপপ্রভাবৎসংকোচবিকাশবানাত্মা দেহানুরূপপরিমাণ ইতি ক্ষপনকাঃ সমাচক্ষতে তৎপক্ষদ্বযং প্রতিক্ষিপতি - বিভুরিতি।"[99] অর্থাৎ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ ও তাঁর অনুগামীরা আত্মাকে অণুপরিমাণ স্বীকার করেছেন। অন্যদিকে জৈনাচার্যদের মতে, আত্মাকে প্রদীপের প্রভার মত সংকোচ ও বিকাশবান্ পদার্থরূপে বর্ণনা করেছেন। তাই ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কারের মতে, গ্রন্থকার এই সম্প্রদায় দুটিকে খণ্ডন করতে, আত্মার বিভুত্ব প্রতিপাদন করেছেন।

সারমঞ্জরীকারের মতে, যেহেতু যোগজ অদৃষ্টজন্য একই সময়ে প্রত্যেক শরীরাবচ্ছেদে অবস্থানকারী একই আত্মা প্রতিটি শরীরে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতিভাত হন। তাই একই আত্মার কায়ব্যূহরূপে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন শরীরাবচ্ছেদে ভোগ সম্পন্ন হওয়ায়, তাকে **বিভু** বলা

হয়েছে। এ বিষয়ে *সারমঞ্জরী*তে বলা হয়েছে - “একস্যানেকশরীরাবচ্ছেদৈনৈককালে ভোগস্য কাযব্যূহত্বাদাহ- বিভিন্নতি। তথা চ যোগজাদৃষ্টাত্ জন্যেষু এককালাবস্থাযিশরীরেষু ভিন্ন-ভিন্ন ইত্যর্থঃ...।”[100]

৬.২. শরীর : *তর্কভাষা*কার আত্মার **ভোগের আশ্রয় অন্ত্যাবয়বী**কে শরীর বলেছেন। কারণ, প্রতিটি শরীরাবচ্ছেদে আত্মার ভোগ সম্পন্ন হয়। তাই **শরীর** হল আত্মার ভোগের আশ্রয়। এর পর গ্রন্থকার ভোগের লক্ষণপ্রসঙ্গে বলেছেন যে, ভোগ হল - **সুখদুঃখের অন্যতর অনুভব**। কিন্তু পরমাত্মাতে উক্ত ভোগাশ্রয়ত্ব প্রসক্ত না হওয়ায়, গ্রন্থকার পরে বৈকল্পিকভাবে **চেষ্টার আশ্রয়কে** শরীর বলেছেন। এই ‘শরীর’ নামক প্রমেয় পদার্থ ব্যাখ্যানে টীকাত্রয়ে যে, বিশেষত্ব লক্ষিত হয়, তা হল -

*তর্কভাষা*কারোক্ত শরীরের উভয় লক্ষণে ‘অন্ত্যাবয়বী’ পদটি প্রযুক্ত হবে। কারণ, শরীরের সকল অবয়বসমূহের দ্বারা যেমন সুখাদি অনুভূত হয়, সেরূপ ‘চেষ্টা’ নামক ক্রিয়াটিও সংঘটিত হয়। তাই ‘চেষ্টাশ্রয়’ বলতে, ‘চেষ্টাশ্রয় যা অন্ত্য অবয়বী’ - এরূপ বুঝতে হবে। ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার পূর্বোক্ত বিষয়টি ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন - “শরীরস্য লক্ষণান্তরমাহ - চেষ্টেতি। অত্রাপি চেষ্টাবদ্বৃত্ত্যন্ত্যাবযবিমাত্রবৃত্তিজাতিমত্ত্বং বিবিক্ষিতম্।”[101] ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার উক্ত বিষয়টি আর একটু বিস্তৃত করে বলেছেন - ‘লক্ষণদ্বযেঽপি করচরণাদাবতিব্যাপ্তিপরিহারার্থমন্ত্যাবযবীতি পদং প্রক্ষেপ্তব্যম্।’[102] অর্থাৎ হস্ত, পাদ প্রভৃতি অবয়বে অতিব্যাপ্তি পরিহারের জন্য *তর্কভাষা*কার যে অন্ত্যাবয়বী পদের প্রয়োগ করেছেন, তার ফলে উভয় লক্ষণেরই অতিব্যাপ্তি দোষ পরিহার হয়। তবে ***সারমঞ্জরী***কার ‘অন্ত্যাবয়বী’ শব্দের অর্থ - ‘সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্যান্তরের অনারম্ভক’ [103] বললেও এই পদটির দ্বারা তিনি কোন দোষ পরিহারের কথা বলেননি।

৬.৩. ইন্দ্রিয় : কেশবমিশ্র ইন্দ্রিয়ের সামান্যলক্ষণ নিরূপণ প্রসঙ্গে শরীরের সঙ্গে সংযুক্ত, জ্ঞানের করণ এবং অতীন্দ্রিয় পদার্থকে ইন্দ্রিয় বলেছেন। তারপর লক্ষণঘটক পদগুলির প্রয়োজনিয়তা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, কাল প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় পদার্থে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য **জ্ঞানকরণ** পদ, ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য **শরীরসংযুক্ত** পদ এবং আলোক প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য **অতীন্দ্রিয়** পদটি লক্ষণে প্রযুক্ত হয়েছে।

তর্কভাষাপ্রকাশে প্রথমে পূর্বপক্ষরূপে বলা হয়েছে যে, 'শরীরসংযুক্তং জ্ঞানকরণমতীন্দ্রিয়ম্' ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের লক্ষণটি কালাদিতে অতিব্যাপ্ত হয়। কেননা, কাল প্রভৃতি পদার্থেও ব্যাপারবৎ জ্ঞানকারণত্ব বিদ্যমান। আবার, সন্নিকর্ষে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য **সংযুক্ত** পদই যথোপযুক্ত। কারণ, সংযোগ দুটি দ্রব্যের মধ্যে হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ দ্রব্যস্বরূপ নয়। অতএব সন্নিকর্ষে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য **শরীর** পদের প্রয়োজন নেই। বস্তুত এরূপ কথন যুক্তিসংগত নয়। কাল কার্যমাত্রের প্রতি সাধারণ কারণ হলেও ব্যাপারবৎ কারণ না নয়।

এরূপ সন্নিকর্ষে অতিব্যাপ্তি পরিহারের জন্য **শরীর** এবং **সংযুক্ত** উভয় পদেরই প্রয়োজন আছে। যেহেতু ইন্দ্রিয় শরীরের সংঙ্গে সংযুক্ত হয়ে জ্ঞানের কারণীভূত মনঃসংযোগের আশ্রয় হয় - "শরীরসংযুক্তমিতি। নন্বিদং কালাদাবতিব্যাপকং তস্যাপি ব্যাপারবত্তেন জ্ঞানকরণত্বাত্। সন্নিকর্ষে অতিব্যাপ্তিবারণায় চ সংযুক্তপদমেবোচিতং ন তু শরীরপদমপীতি চেন্ন। স্মৃত্যজনকজ্ঞানকারণমনঃসংযোগাশ্রয়ত্বস্য তত্ত্বাত্।"[104]

এরূপ **জ্ঞানকরণম্** পদটির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*টীকায় বলা হয়েছে যে, যদি করণমাত্রই ইন্দ্রিয় হয়, তাহলে ইন্দ্রিয়ের লক্ষণটি বৃক্ষছেদনাদি ক্রিয়ার করণ কুঠারাদিতে অতিব্যাপ্ত হবে। সেজন্য শুধুমাত্র **করণ** না বলে **জ্ঞানকরণ** বলা হয়েছে। আবার 'জ্ঞানকরণমতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ম্' - এরূপ বললে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষের ন্যায় অনুমিতির করণ ধূমাদিতেও ইন্দ্রিয়ের লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি হয়। সেজন্য বলেছেন **শরীরসংযুক্তম্**। *তর্কভাষাপ্রকাশিকাশে* এই বিষয়ে বলা হয়েছে - "করণমিন্দ্রিয়মিত্যুক্তে ছিদিক্রিয়াসাধনে কুঠারাদাবতিব্যাপ্তিঃ। তদর্থমুক্তম্ - **জ্ঞানেতি**। তাবত্যুক্তেঽনুমিতিকরণে ধূমাদাবতিব্যাপ্তি-স্তন্নিবৃত্ত্যর্থং **শরীরসংযুক্তমিতি**।"[105]

তবে *সারমঞ্জরী*তে পূর্বোক্ত **শরীর** এবং **সংযুক্ত** পদের পৃথক প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য **সংযুক্ত** পদ এবং চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিষ্ঠ দোষে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য **শরীর** পদের প্রয়োজন। তাই বলা হয়েছে - "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষে অতিব্যাপ্তিবারণায - সংযুক্তপদম্। চক্ষুরাদিনিষ্ঠদোষেঽতিব্যাপ্তিবারণায - শরীরপদম্।"[106] এখানে চক্ষুরাদি নিষ্ঠ দোষ বলতে, অন্ধত্ব, বধিরত্ব প্রভৃতি দোষের কথা বলা হয়েছে।

কোন কোন সংখ্যাচার্যের মতে, ঘ্রাণাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ত্বগিন্দ্রিয় সর্বশরীরে ব্যাপ্ত হওয়ায়, চক্ষুরাদি অন্য সকল ইন্দ্রিয় স্বীকারের প্রয়োজন নেই। যেহেতু ত্বগিন্দ্রিয় শরীরের সর্বত্র থাকে, তাই চক্ষু স্থানগত ত্বগিন্দ্রিয়ই রূপের প্রত্যক্ষ করে। অত এব চক্ষু স্থানগত ত্বগিন্দ্রিয়ই চক্ষুরিন্দ্রিয় নামে অভিহিত হয়। *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*কারের মতে, সাংখ্যাচার্যদের উক্ত মতের নিরসন করতে গ্রন্থকার **'তানি চ ইন্দ্রিয়াণি'** ইত্যাদির দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বিভাগ নির্দেশ করেছেন।[107]

৬.৪. অর্থ : কেশবমিশ্র **অর্থ** নামক চতুর্থ প্রমেয়ের স্বরূপ নিরূপণপ্রসঙ্গে ষট্-পদার্থাঃ... ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ এবং সমবায় - এই ছয়টি ভাবপদার্থের সন্নিবেশ করেছেন। এই ছয়টি ভাবপদার্থের বর্ণার পর গ্রন্থকার অভাব পদার্থেরও বর্ণনা করেছেন। *সারমঞ্জরীতে* এর ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে - "অর্থাঃ ভাবাঃ। ষডিতি কথনাদভাবঃ সপ্তমঃ সূচিতঃ। তথা চ পদার্থো দ্বিবিধঃ ভাবাভাবভেদাদিত্যার্থিকো বিভাগ ইতি বিভাগ ইতি সূচিতঃ। নিঃশ্রেযসরূপাভাবস্য পার্থক্যেন নিরূপযিষ্যমানত্বাৎ নেদানীং তস্য বিভাগঃ কৃতঃ।"[108] এই ভাবে টীকাত্রয়ে বিচারপূর্বক দ্রব্যাদি পদার্থের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৬.৫. বুদ্ধি : কেশবমিশ্র বুদ্ধি নামক প্রমেয় পদার্থের নিরূপণ প্রসঙ্গে প্রথমে বলেছেন- বুদ্ধি, উপলব্ধি, জ্ঞান, প্রত্যয় ইত্যাদি পর্যায় শব্দের দ্বারা যা অভিহিত হয়, তাই বুদ্ধি। আবার তারপর বৈকল্পিকরূপে অর্থের প্রকাশকে বুদ্ধি বলেছেন।

সাংখ্যশাস্ত্রে বুদ্ধ্যাদি শব্দগুলি ভিন্ন অর্থে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রের তা স্বীকৃত হয়নি। অত এব পর্যায়বাচক শব্দের দ্বারা এখানে বুদ্ধির স্বরূপ কথিত হওয়ায়, এখানে সাংখ্যমতও খণ্ডিত হয়েছে।

বুদ্ধি নামক প্রমেয়ের স্বরূপ ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*তেও প্রথমে পূর্বোক্ত সাংখ্যমত নিরসণের কথা বলা হয়েছে - 'বুদ্ধ্যাদিশব্দানামর্থভেদপ্রতিপাদনপরং সাংখ্যমতং প্রত্যাখ্যাতুং পর্যাযশব্দানাখ্যাতুং বুদ্ধ্যত উপলভতে জানাতি প্রত্যেতীতি সমানার্থতযা প্রযোগদর্শনাৎ প্রদর্শিতা প্রক্রিয়া পরিভাষামাত্রমিত্যলম্।'[109]

প্রসঙ্গতঃ বক্তব্য হল - ন্যায়মতে, জ্ঞান গৃহীত হয় - অনুব্যবসায়ের দ্বারা। আর এই অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের প্রামাণ্য নিরূপিত হয় প্রবৃত্তিসাফল্যমূলক অনুমানের দ্বারা। কিন্তু ভাট্টমতে, জ্ঞান এবং জ্ঞানের প্রামাণ্য উভয় গৃহীত হয় অর্থাপত্তি নামক প্রমাণের দ্বারা। তাঁরা

জ্ঞান এবং জ্ঞানের প্রামাণ্য নিরূপণ - উভয় ক্ষেত্রে 'জ্ঞাততা' নামক ধর্ম স্বীকার করেন। আবার প্রভাকর মতে, জ্ঞান হল স্বপ্রকাশ। এই জ্ঞান নিজেকে, ঘটাদি বিষয়কে এবং নিজের আশ্রয় আত্মাকে একই ক্ষণে প্রকাশ করে। এই বিষয়টিকে ত্রিপুটী-প্রত্যক্ষ বলা হয়।

কিন্তু ন্যায়মতে, জ্ঞান হল অর্থের প্রকাশক। তাই *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*কারের মতে, কেশবমিশ্র 'অর্থপ্রকাশ বা বুদ্ধিঃ' ইত্যাদি বুদ্ধির যে বৈকল্পিক লক্ষণ করেছেন, এর দ্বারা পূর্বোক্ত মীমাংসক মতগুলি খণ্ডিত হয়েছে - "জ্ঞানস্য স্বজন্যজ্ঞাততাদিপদবেদনীযপ্রকাশানুমেযত্বং মন্যন্তে মীমাংসকাঃ। তন্মতমপাকর্তুমাহ-অর্থপ্রকাশ ইতি।"[110]

তবে *তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকাতে বুদ্ধি নামক প্রমেয়পদার্থটির লক্ষণ বিচার এবং সাংখ্য বা মীমাংসকমতের খণ্ডন করা হয়নি। গুণপদার্থের ব্যাখ্যায় গ্রন্থকার যে অর্থের প্রকাশকে বুদ্ধি বলেছেন, সেই বিষয়টির উল্লেখ পাওয়া যায় - "অর্থেতি। বুদ্ধিত্বং লক্ষণমিত্যর্থঃ।"[111]

এরূপ *সারমঞ্জরী*তেও এই বিষয়ে বলা হয়েছে - "বুদ্ধিং নিরূপযতি। বুদ্ধিত্বং জ্ঞানত্বং পর্যাযরূপং জাতিবিশেষরূপং তদ্বত্বং লক্ষণম্।"[112] অর্থাৎ বুদ্ধিত্ব এবং জ্ঞানত্ব যেহেতু পর্যায়বাচক, সেজন্য বুদ্ধির লক্ষণও সেই অনুসারে নিরূপিত হয়েছে। অত এব এই টীকাটিতেও কোন প্রকার পূর্বপক্ষ খণ্ডনের কথা বলা হয়নি।

তারপর *তর্কভাষা*কার সাকারজ্ঞানবাদ নিরসন করেছেন। টীকাত্রয়ে সেই বিষয়টি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

৬.৬. মন : *তর্কভাষা* গ্রন্থে মন নামক প্রমেয়পদার্থটির তিন প্রকার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যথা, - প্রথমত - ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়রূপে, দ্বিতীয়ত - নবম দ্রব্যরূপে এবং তৃতীয়ত - মহর্ষি গৌতম স্বীকৃত দ্বাদশ প্রমেয়ের মধ্যে ষষ্ঠ প্রমেয়রূপে। পূর্বে ইন্দ্রিয় দ্রব্যপদার্থরূপে মন ব্যাখ্যাত হওয়ায়, *তর্কভাষাপ্রকাশ* এবং *সারমঞ্জরীতে* এই স্থলে বিশেষ কিছু বলা হয়নি। তবে *তর্কভাষাপ্রকাশিকাতে* সেই বিষয়টি একটু পরিস্কার করে বলা হয়েছে - "ক্রমপ্রাপ্তং মনো নিরূপযতি - **অন্তরিতি**। কিমত্র প্রমাণমিত্যাশঙ্ক্য প্রাগেব নিরূপিতমিত্যাহ-**তচ্চেতি**। তন্মনঃ প্রমাণবত্তযা দ্রব্যনিরূপণবেলাযামুক্তমিত্যর্থঃ।"[113] অর্থাৎ দ্রব্য পদার্থের বর্ণনা প্রসঙ্গে মন নামক পদার্থটি বিচারপূর্বক নিরূপিত হয়েছে। অর্থাৎ সেখানে মনের অণুত্ব, নিত্যত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। আর সেজন্যই এই স্থলে তা অনুক্ত হয়েছে।

৬.৭. প্রবৃত্তি : *তর্কভাষা*কার এই প্রবৃত্তি নামক প্রমেয়পদার্থের স্বরূপ নিরূপণপ্রসঙ্গে প্রবৃত্তিকে ধর্ম এবং অধর্মমী যাগাদি ক্রিয়া বলেছেন। তাঁর মতে, এই প্রবৃত্তির দ্বারা জগতের সকল ব্যবহার সম্পন্ন হয়।

এই প্রবৃত্তির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে *তর্কভাষাপ্রকাশে* - "ক্রিয়াপদমারম্ভপদস্য সূত্রস্থস্য পর্যায়ঃ। তথা চ প্রবৃত্তিস্ত্রিবিধা। বাক্-ক্রিয়া বুদ্ধিক্রিয়া শরীরক্রিয়া চেত্যর্থঃ। বচনোৎপাদনদ্বারাদৃষ্টহেতুরনিত্যযত্নো বাগারম্ভঃ। আত্মধর্মোৎপাদনদ্বারা তাদৃশঃ প্রযত্নো বুদ্ধ্যারম্ভঃ। বুদ্ধিশ্চাত্র মনঃ। ভোগাবচ্ছেদকক্রিয়া দ্বারা তাদৃশঃ প্রযত্নঃ শরীরারম্ভ ইতি ভাবঃ। ননু প্রবৃত্তের্ধর্মাধর্মহেতুত্বে জগদ্ধেতুত্বং স্যাদিত্যত্রেষ্টাপত্তিমাহ। **তস্যা** ইতি।" অর্থাৎ ন্যায়সূত্রকারকে অনুসরণ করে, এখানে প্রবৃত্তির তিন প্রকার বিভাগের কথা বলা হয়েছে।

তবে *তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকায় সেই প্রবৃত্তিকে আয়ুর্ঘিতাদিবৎ সাধ্যবাচক সাধন বলা হয়েছে - "ননু প্রবৃত্তিশব্দেন কথং ধর্মাধর্মাবুচ্যতে ইত্যাশঙ্ক্য তত্রোপপত্তিমাহ - প্রবৃত্তিরিতি। আয়ুর্ঘৃতমিত্যাদিবৎসাধ্যবাচিনা সাধনং লক্ষ্যত ইত্যর্থঃ।"[114] অর্থাৎ ঘৃত যেমন আয়ুবর্ধনের সাধন, সেরূপ প্রবৃত্তিরও ধর্ম ও অধর্ম উৎপাদনের সাধন। কিন্তু প্রবৃত্তির দ্বারা আমরা কীভাবে ধর্মাধর্ম বুঝব, তাই গ্রন্থকার প্রবৃত্তিকে ধর্মাধর্মময়ী নামে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ এখানে প্রবৃত্তির কোন প্রকার বিভাগ নিরূপিত না হলেও তার সামান্যলক্ষণ কথিত হয়েছে।

এরূপ *সারমঞ্জরী*তেও প্রথমে, ধর্মাধর্মজনিকা জন্য কৃতিকে প্রবৃত্তি বলা হয়েছে। কিন্তু প্রবৃত্তি যদি কেবল ধর্ম বা অধর্মমূলকই হয়, তাহলে ভোজনাদি প্রবৃত্তিতে সেই লক্ষণটি অব্যাপ্ত হবে। তাই পরে সেই লক্ষণটিকে পরিষ্কার করে বলেছেন - প্রকারতাবতী জন্য কৃতিকে প্রবৃত্তি - "ধর্মাধর্মজনিকা জন্য কৃতিঃ প্রবৃত্তিঃ। সা যাগাদিবিষযিণীতি কশ্চিত্ তন্ন। ভোজনাদিপ্রবৃত্তাবব্যাপ্তেঃ। বস্তুতঃ প্রকারতাবতী জন্য কৃতিঃ প্রবৃত্তিঃ। জীবনযোনিযত্নবারণায - প্রকারতেতি। ঈশ্বরকৃতিবারণায - জন্যেতি।"[115]

*সারমঞ্জরী*কার দৈনন্দিন জীবনে সংসারে যে সকল প্রবৃত্তিগুলি দৃষ্ট হয়, সেগুলির কথা বলেছেন - "সা যাগাদিবিষযিণী ধর্মজনিকা, চৌর্যাদিবিষযিণী অধর্মজনিকা। ভোজনাদিবিষযিণী সুখজনিকা। নিষ্ফলবিষযিণী দুঃখজনিকেতি দ্রষ্টব্যম্। সা ইচ্ছাজন্যা।"[116]

৬.৮. দোষ : *তর্কভাষা*কার দোষ নামক প্রময়ে পদার্থের নিরূপণ প্রসঙ্গে রাগ দ্বেষ এবং মোহ ভেদে ত্রিবিধ দোষের কথা বলেছেন। এই দোষত্রয়ের মধ্যে রাগ হল অনুরাগ বা ইচ্ছা স্বরূপ, দ্বেষ হল মন্যু বা ক্রোধস্বরূপ এবং মোহ হল বিপর্যয় বা মিথ্যাজ্ঞান স্বরূপ।

এই 'দোষ' নামক প্রমেয়পদার্থটির স্বরূপ ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে নির্বাচিত তিনটি টীকাতেই টীকাকারগণ নিজ নিজ শৈলী অনুসারে এর লক্ষণ প্রদান করেছেন। যেমন - *তর্কভাষাপ্রকাশে* বলা হয়েছে যে, যার মধ্যে প্রবৃত্তির জনকত্ব বিদ্যমান, প্রত্যক্ষগম্য এবং যা আত্মার বিশেষগুণ, তাই প্রবৃত্তি। সেখানে বলা হয়েছে - "প্রবৃত্তিজনকপ্রত্যক্ষাত্মবিশেষগুণত্বং সামান্যলক্ষণং হৃদি নিধায দোষান্বিভজতে। **দোষা ইতি**।"[117] এরূপ *তর্কভাষাপ্রকাশিকাতে* বলা হয়েছে যে, যা আত্মাকে দূষিত করে, তাই দোষ - 'আত্মানং দূষযন্তীতি দোষা ইত্যর্থং হৃদি নিধাযাহ - দোষা ইতি।'[118] আবার সারমঞ্জরীতে বলা হয়েছে যে, দোষ পদের দ্বারাই দোষের সামান্যলক্ষণ উক্ত হয়। অথবা রাগ, দ্বেষ ও মোহের মধ্যে যে কোন একটির দ্বারা দোষ সূচিত হয় - "সামান্যলক্ষণং দোষপদবাচ্যত্বম্। রাগদ্বেষমোহান্যতমত্বং বা।"[119]

তারপর রাগাদি দোষত্রয়ের বিশেষ লক্ষণ নিরূপিত হয়েছে। যেমন - *তর্কভাষাপ্রকাশে* অদৃষ্ট এবং প্রযত্নের জনক ইচ্ছাকে রাগ বলা হয়েছে। এরূপ *সারমঞ্জরীতে* উৎকট ইচ্ছাকে রাগ বলা হয়েছে। কিন্তু *তর্কভাষাপ্রকাশিকাতে* দোষপদার্থের সামান্যলক্ষণ নিরূপিত হলেও উক্ত দোষের রাগাদি ভেদবিষয়ে কিছু বলা হয়নি। এই বিষয়ে তাঁর এরূপ নিরবতার কারণ হতে পারে, *তর্কভাষা*কার যেহেতু উক্ত বিষয়গুলি অতি সরলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, সেজন্য তিনি আর সেই বিষয়গুলি সম্বন্ধে কোন প্রকার আলোকপাত করেননি।

৬.৯. প্রেত্যভাব : মৃত্যুর পর জীবের পুনরায় জন্মগ্রহণের বিষয়কে প্রেত্যভাব বলা হয়। এই বিষয়ে *তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকাতে বলা হয়েছে - "আত্মনঃ শরীরাদিদোষপর্যন্তেন বিশ্লেষপূর্বকঃ সম্বন্ধঃ প্রেত্যভাব ইত্যর্থঃ।"[120] অর্থাৎ আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয়পদার্থের মধ্যে শরীর হতে দোষ পর্যন্ত পদার্থের সঙ্গে আত্মার বিচ্ছেদপূর্বক যে সংযোগ, সেটিই প্রেত্যভাব।

তর্কভাষাপ্রকাশিকাতে বলা হয়েছে -"মৃত্বোৎপত্তিঃ প্রেত্যভাব ইত্যাহ - **পুনরিতি**। ননু নিত্যস্যাত্মনঃ কথময়ং ঘটতে তত্রাহ - **স চেতি**।"[121] অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীবের পুনরায় উৎপত্তিকে যেহেতু প্রেত্যভাব বলা হয়, গ্রন্থকার 'পুনঃ' পদটি গ্রহণের দ্বারা সেই বিষয়টি বুঝিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হল- নিত্যত্ববিশিষ্ট আত্মার প্রেত্যভাব কীভাবে সম্পন্ন হবে? এরূপ

সংশয়ের নিরিখে বলা হয়েছে যে, গ্রন্থকার ‘স চাত্মনঃ পূর্বদেহ...’ ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সেই বিষয়ে সংশয়ের নিরসণ করেছেন।

এরূপ *সারমঞ্জরী*তেও বলা হয়েছে যে, আত্মা নিত্য হওয়ায়, এখানে ‘উৎপত্তি’ বলতে, শরীরান্তরের ‘উৎপত্তি’ বুঝতে হবে। যদিও বাল্যশরীর ক্রমশ যৌবন, স্থবির প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে শরীরের গঠনগত বৈশিষ্ট পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ফলে বাল্যশরীরের নাশ হয় এবং যৌবনশরীরের উৎপত্তি হয়। কিন্তু সেক্ষেত্র শরীরে অবস্থান্তরের উৎপত্তি বা বিনাশ হলেও সেই শরীরনিষ্ঠ বিষ্ণুমিত্রত্বাদি জাতি নিত্য। অর্থাৎ সেই জাতির কখনও উৎপত্তি বা ধ্বংস হয় না। তবে সেই বিষ্ণুমিত্রত্বাবচ্ছিন্ন শরীরের নাশে চৈত্রশরীরের উৎপত্ত হয়।[122]

এখানে জ্ঞাতব্য যে, টীকাত্রয়ের মধ্যে তর্কভাষাপ্রকাশে প্রেত্যভাবের লক্ষণ নিরূপিত হয়েছে। তর্কভাষাপ্রকাশিকাতে প্রেত্যভাবের স্বরূপ বিষয়ক প্রতিটি পদ যথাযথভাবে ব্যাখ্যাত হলেও এখানে প্রেত্যভাবের কোন লক্ষণ উক্ত হয়নি। এরূপ *সারমঞ্জরী*তেও টীকাকার প্রেত্যভাব সম্বন্ধে গ্রন্থকারোক্ত বিষয়ের উদাহরণ সহযোগে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করলেও প্রেত্যভাবের কোন প্রকার লক্ষণ নিরূপণ করেননি।

৬.১০. ফল : জীব তাঁর কর্ম অনুসারে ফল ভোগ করে। সুখদুঃখাদির সাক্ষাৎকারই ভোগ পদের বাচ্য। তাই *তর্কভাষা*কার বলেছেন -“ফলং পুনর্ভোগঃ, সুখদুঃখান্যতরসাক্ষাৎকারঃ।”[123] প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ এই ফলকে মুখ্য ও গৌণ ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন।

তর্কভাষাপ্রকাশকারের মতে, গ্রন্থকার ‘ফল’ বলতে যে, ভোগের কথা বলেছেন, সেই ভোগ মিথ্যাজ্ঞান প্রযুক্ত ব্যক্তিরেই সম্পন্ন হয়। কিন্তু জীবন্মুক্ত ব্যক্তির তা হয় না।

তবে ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার ফল পদার্থের ব্যাখ্যা বিশেষ কিছু বলেননি। তবে জীবের জন্মরূপ উৎপত্তি মানেই দুঃখ। আর এই দুঃখ ভোগের নিমিত্তই তার জন্ম হয়। অত এব ফল ও দুঃখ সম্পৃক্ত। আর সেই কারণে প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ শরীর হতে দুঃখ পর্যন্ত বিষয়কে ফল নামে অভিহিত করেছেন। সেরূপ অভিপ্রায়ে *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*কার - ‘ফলদুঃখয়োঃ স্বরূপমাহ - ফলমিত্যদিনা।’

তবে এই বিষয়ে *সারমঞ্জরী*কার আর একটু বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। *সারমঞ্জরী*তে বলা হয়েছে - “যদ্যপি সুখদুঃখাভাবযোরেব ফলত্বম্। তদর্থা হি বিধিনিষেধপ্রবৃত্তিঃ। তথাপি তযোঃ অজ্ঞাতযোঃ অপুরুষার্থত্বাত্ সাক্ষাৎকারোঽপি ফলম্। বেদাদিনা তৎসাধনকার্যাদেঃ

অনববোধনেঽপীষ্টত্বম্।”[124] এখানে অজ্ঞাত শব্দের অর্থ হল অপূর্ব। অর্থাৎ টীকাকার যজ্ঞীয় অপূর্বের কথা বলেছেন। যদিও সুখ বা দুঃখ ভাববিশিষ্ট পদার্থেরই ফলত্ব সিদ্ধ হয় এবং তার বিষয় হল - বিধি, নিষেধ ও প্রবৃত্তি ; তথাপি অপুরুষার্থ হেতু বিধি নিষেধাদির ফলে উৎপন্ন অপূর্বের সাক্ষাৎকারই 'ফল' নামে অভিহিত হয়। এর দ্বারা বেদাদি ও তার সাধন যজ্ঞের ফলে উৎপন্ন অপূর্বও ফল পদবাচ্য। টীকাত্রয়ে এভাবে ফল নামক প্রমেয়পদার্থটি ব্যাখ্যাত হয়েছে।

৬.১১. দুঃখ : *তর্কভাষা*কার দুঃখ নামক প্রমেয়পদার্থের নিরূপণপ্রসঙ্গে দুঃখকে পীড়া বলে তার একুশ প্রকার ভেদ স্বীকার করেছেন।

*তর্কভাষাপ্রকাশিকা*তে ফল এবং দুঃখ নামক প্রমেয়পদার্থের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বিস্তৃত কিছু বলেননি। তবে গুণপদার্থের নিরূপণাবসরে দুঃখের লক্ষণ বিষয়ে বলা হয়েছে - 'দুঃখত্বং নাম প্রধ্বংসপ্রতিযোগিত্বরহিতসমবেতত্বরহিতসুখদ্বেষব্যতিরিক্তপ্রত্যক্ষাত্মগুণসমবেতগুণত্বসাক্ষাত্ব্যাপ্য-জাতিঃ।'[125] অর্থাৎ প্রধ্বংসাভাবের প্রতিযোগিত্বরহিত, সমবেতত্বরহিত, সুখ ও দ্বেষ ভিন্ন আত্মগুণত্বব্যাপ্যজাতিবিশিষ্ট পদার্থই হল দুঃখ।

তর্কভাষাপ্রকাশিকা টীকাটিতে দুঃখত্ব জাতির দ্বারা দুঃখের লক্ষণ নিরূপণ করে, দুঃখের সেই গৌণ ও মুখ্য ভেদের কথা বলা হয়েছে - "পীড়েতি। দুঃখত্বজাতিমদিত্যর্থঃ। সংপ্রদায়স্তাত্মাপবর্গান্যত্বে সতি দুঃখসংবন্ধিপ্রমেয়ত্বমেব দুঃখত্বম্। লক্ষ্যতাবচ্ছেদকং দুঃখত্বমত্র হেযত্বম্। লক্ষণে চ মুখ্যদুঃখস্য প্রবেশ ইতি নাত্মাশ্রযঃ।"[126] অর্থাৎ এখানে দুঃখত্বজাতিবিশিষ্ট পদার্থকে দুঃখ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

একই ভাবে *সারমঞ্জরী* টীকাতেও দুঃখত্ব জাতির দ্বারা দুঃখের লক্ষণ নিরূপণ করে, সেই জাতির প্রামাণ্য নিরূপিত - "দুঃখেতি পীড়াপদবাচ্যং দুঃখত্বজাতিমদিত্যর্থঃ। দুঃখত্বং জাতিঃ প্রত্যক্ষত্বাদধর্মকার্যতাবচ্ছেদকত্বাচ্চ সিদ্ধম্।"[127] অর্থাৎ দুঃখ হল পীড়া পদবাচ্য।

অত এব এখানে জ্ঞাতব্য যে, টীকাত্রয়ে দুঃখত্ব জাতির দ্বারা দুঃখের লক্ষণ নিরূপিত হলেও কেবলমাত্র *সারমঞ্জরী* টীকাতে সেই জাতি প্রামাণ্য নিরূপিত হয়ে। এরূপ *তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকাটিতে উক্ত দুঃখের গৌণ ও মুখ্য ভেদের কথা বলা হয়েছে।

৬.১২. অপবর্গ : কেশবমিশ্র মোক্ষকে অপবর্গ বলে, একুশ প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির দ্বারা সেই অপবর্গ লাভের কথা বলেছেন। *তর্কভাষা*কার, ন্যায়শাস্ত্রবেত্তা পুরুষ, যিনি সকল

প্রকার তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করে, বিষয়সমূহের দোষ দর্শন করে, বিরক্ত হয়েছেন, সেই মুমুক্ষুকে যোগসমাধির দ্বারা একুশ প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির কথা বলেছেন।

তর্কভাষাপ্রকাশ এবং *তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকাদুটিতে গ্রন্থকারোক্ত প্রতিটি পদের যথাযথ ব্যাখ্যা করা হলেও, অপবর্গের কোন প্রকার লক্ষণ নিরূপিত হয়নি।

উক্ত মোক্ষের স্বরূপ নিরূপণপ্রসঙ্গে ***সারমঞ্জরীতে*** বলা হয়েছে - "মোক্ষং লক্ষযতি - মোক্ষ ইতি। স্বসমানাধিকরণস্বাসমানকালীনদুঃখধ্বংসঃ।"[128] এখানে **স্ব**-পদের দ্বারা দুঃখকে বুঝতে হবে। অর্থাৎ দুঃখের সমান অধিকরণ এবং দুঃখের অসমানকালীন দুঃখধ্বংসই হল মোক্ষ। কিন্তু **ধ্বংসাভাব** মাত্রই মুক্তি নয়, কেননা, তাহলে ঘটাদির ধ্বংসকেও মোক্ষ বলতে হবে। তাই **দুঃখধ্বংস** পদটির গ্রহণ হয়েছে। এরূপ সংসারকালীন দুঃখধ্বংসে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য সেই দুঃখধ্বংসের বিশেষণরূপে **অসমানকালীনত্ব** পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। কারণ, সংসারদশায় প্রতিনিয়ত দুঃখের উৎপত্তি এবং বিনাশ হয়। পূর্বোক্ত একুশ প্রকার দুঃখের মধ্যে, যে সময় একটি দুঃখের ধ্বংস হয়, সেই সময় অন্য একটি দুঃখের উৎপত্তি হয়। অত এব সংসারকালীন দুঃখধ্বংস দেবদত্তাদি আত্মাস্থিত অন্য দুঃখের সমকালীন। কিন্তু সেই দুঃখধ্বংসই মোক্ষ, যে দুঃখধ্বংসে সেই অধিকরণে আর অন্য কোন দুঃখের উৎপত্তি হবে না। অর্থাৎ যে দুঃখধ্বংস অন্য দুঃখের অসমানকালীন।

আবার যদি কেবলমাত্র **অসমানকালীনদুঃখধ্বংস**কে মোক্ষ বলা হয়, তাহলে মহাপ্রলয়ে জীবের সকল প্রকার দুঃখের ধ্বংস হওয়ায়, আর ঐ দুঃখ অন্য কোন দুঃখের সমকালীন না হওয়ায়, তাতে মোক্ষের এরূপ লক্ষণটি প্রসক্ত হয়। কিন্তু মহাপ্রলয়ের পূর্বে দেবদত্তাদি আত্মাস্থিত দুঃখধ্বংস, যজ্ঞদত্তাদি আত্মাস্থিত দুঃখের সমকালীন। অতএব এক্ষেত্রে লক্ষণটি মোক্ষে প্রসক্ত হয় না। তাই লক্ষণে **স্বসমানাধিকরণ** পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ দুঃখের সমান অধিকরণ এবং অসমকালীন দুঃখধ্বংসকেই মোক্ষ বলা হবে । সুতরাং দেবদত্তাদি দুঃখধ্বংস, যজ্ঞদত্তাদি দুঃখের সমকালীন হলেও সমান অধিকরণ না হওয়ায় পূর্বোক্ত **স্বসমানাধিকরণস্বাসমানকালীনদুঃখধ্বংস** - এরূপ মোক্ষের লক্ষণটি সকল প্রকার দোষশূন্য বলা যায়। এভাবে টীকাত্রয়ে কেশবমিশ্রসম্মত প্রমেয় পদার্থগুলি তুলনামূলকভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে।

******

উপসংহার :

এই গবেষণানিবন্ধের মূল্যায়নে তিনটি টীকা হতে উপস্থাপিত বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় যে বিশেষত্বগুলি উপলব্ধ হয়, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হল -

ক. ন্যায় ও বৈশেষিকসম্মত **আত্মার** স্বরূপ বর্ণনাপ্রসঙ্গে *তর্কভাষা*কার আত্মাকে দেহাদিব্যতিরিক্ত, প্রতি শরীরে ভিন্ন, বিভু ও নিত্য পরিমাণ বলেছেন। আত্মা শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন হতে অতিরিক্ত। তাই গ্রন্থকার তাকে দেহাদিব্যতিরিক্ত বলেছেন। সুখাদির বৈচিত্রবশত আত্মা প্রতিশরীতে ভিন্ন। প্রতি শরীরে আত্মার সুখদুঃখাদি কার্য উপলব্ধ হওয়ায়, আত্মা বিভু। বিভুত্বের জন্য আকাশাদির মত নিত্য।

তর্কভাষাপ্রকাশিকাকারের মতে, আত্মার এতাদৃশ স্বরূপগুলির মধ্যে **'প্রতি শরীরে ভিন্ন'** - এর দ্বারা অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজের একাত্মবাদের খণ্ডন হয়। যেহেতু তাঁরা আত্মাকে এক এবং অদ্বিতীয়রূপে ব্যাখ্যা করেছেন।

এরূপ রামানুজ মতে, আত্মা অণুপরিমাণ। তাঁদের মতে, চুলের অগ্রভাগকে শত-ভাগে বিভক্ত করে, তারপর ঐ শত ভাগের এক ভাগকে পুনরায় শতভাগে কল্পনা করলে, যে সূক্ষ্মপরিমাণ পাওয়া যাবে, সেটাই জীবাত্মার পরিমাণ বুঝতে হবে। আবার জৈন মতে, প্রাণীর পরিমাণ অনুসারে সেই প্রাণীতে স্থিত আত্মার পরিমাণ বুঝতে হবে। অর্থাৎ পিপিলিকার আত্মা গজে বর্তমান আত্মার তুলনায় সল্পাকৃতির। অত এব জৈনমতে, আত্মা দেহ বা মধ্যমপরিমাণবিশিষ্ট, সংকোচ-বিকাশশীল পদার্থ। *তর্কভাষা*তে 'বিভুত্ব' প্রতিপাদন করায় এর দ্বারা পূর্বোক্ত মতের খণ্ডন হয়। আবার **'নিত্য'** পদটির দ্বারা বৌদ্ধদের ক্ষণিকত্ববাদের খণ্ডন হয়।

এভাবে *তর্কভাষাপ্রকাশিকাতে* পূর্বপক্ষ খণ্ডনপূর্বক আত্মার পূর্বোক্ত স্বরূপগুলি প্রতিপাদিত হয়েছে। যার দ্বারা জিজ্ঞাসু পাঠক সহজেই পরতন্ত্র খণ্ডনপূর্বক ন্যায়সম্মত আত্মার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করতে পারবে। অন্য দুটি টীকাতে এভাবে আত্মস্বরূপ ব্যাখ্যানে পূর্বপক্ষ খণ্ডনের কথা বলা হয়নি। অত এব এক্ষেত্রে এই টীকাটির গুরুত্ব বা অবদান যে কতখানি, তা সহজেই অনুমেয়।

খ. শরীর নামক প্রমেয় পদার্থের বর্ণনাবসরে *তর্কভাষা*কার চেষ্টার আশ্রয়কে শরীর বলেছেন। আপত্তি হতে পারে, মৃত-শরীরে চেষ্টা থাকে না। কিন্তু শরীর থাকে। তাহলে চেষ্টার আশ্রয়কে কীভাবে শরীর বলা যায়? এরূপ জিজ্ঞাসার নিরসন করতে, বিষয়টি তিনটি টীকাতেই পর্যালোচিত হয়েছে। যেমন - ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কারের মতে, চেষ্টাবদ্ অন্ত্যাবয়বিত্বধর্মবিশিষ্ট পদার্থকে যদি শরীর বলা হয়, তাহলে লক্ষণটিতে কোন প্রকার দোষ প্রসক্ত হয় না। জীবিত বা মৃত উভয় শরীরেই তা প্রসক্ত হবে। কারণ, চেষ্টা না থাকলেও তাতে অন্ত্যাবয়বিত্বরূপ ধর্ম থাকবে। কেননা, হস্তাদি অবয়বগুলি তখনও সেখানে বিদ্যমান।

তর্কভাষাপ্রকাশিকাকারের মতে, মৃত-শরীরটিও যেহেতু পূর্বে কোন আত্মার ভোগ বা চেষ্টার আশ্রয় ছিল। সেজন্য বর্তমানেও পূর্বের সেই ব্যবহার অনুসারে মৃত-শরীরকেও শরীর বলতে হবে।

সারমঞ্জরীকারের মতে, মৃত-শরীরে চেষ্টাদি ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন হয় না ঠিকই সেই শরীরে তখনও সেই শরীরগত জাতি বিদ্যমান থাকে। আর তাই সেই অবস্থাতেও তাতে 'বিষ্ণুমিত্রোঽয়ম্' - এরূপ প্রতীতি হয়। এর ফলে সেই শরীরে 'বিষ্ণুমিত্রত্ব' জাতি যে বিদ্যমান, তা বোঝা যায়।

সুতরাং মৃত-শরীরে চেষ্টা না থাকলেও টীকাকারদিগের পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে আমরা তাকে শরীর বলতে পারি।

গ. *তর্কভাষা*কার **ইন্দ্রিয়** নামক প্রমেয়ের বর্ণনাপ্রসঙ্গে ঘ্রাণ, রাসন ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের ছয় প্রকার ভেদের কথা বলেছেন। এখন বক্তব্য হল, কোন কোন সংখ্যাচার্যের মতে, ঘ্রাণাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ত্বগিন্দ্রিয় সর্বশরীরে ব্যাপ্ত হওয়ায়, চক্ষুরাদি অন্য সকল ইন্দ্রিয় স্বীকারের প্রয়োজন নেই। যেহেতু ত্বগিন্দ্রিয় শরীরের সর্বত্র থাকে, তাই চক্ষু স্থানগত ত্বগিন্দ্রিয়ই রূপের প্রত্যক্ষ করে। সুতরাং চক্ষু স্থানগত ত্বগিন্দ্রিয়ই চক্ষুরিন্দ্রিয় নামে অভিহিত হয়।

বস্তুত তা যুক্তি যুক্ত নয়। কেননা, যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে গুণ বিশেষের গ্রহণ হয়, সেই ইন্দ্রিয় সেই গুণগ্রাহক নামে অভিহিত হয়। যেমন - গন্ধ গ্রাহক ইন্দ্রিয় ঘ্রাণ, রস গ্রাহক ইন্দ্রিয় রসনা ইত্যাদি। সুতরাং ইন্দ্রিয়গুলি প্রতিনিয়ত উৎকর্ষপ্রযুক্ত হয়ে নিজ নিজ বিষয় গ্রহণে সমর্থ হয়। তাই সকল ইন্দ্রিয়ে ত্বগিন্দ্রিয়র সত্তা বর্তমান হলেও, ত্বক্ই একমাত্র ইন্দ্রিয়

হতে পারে না। তাহলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অন্যান্য বিষয়ের উপলব্ধি হত না। অন্ধব্যক্তিরও স্পার্শন প্রত্যক্ষের দ্বারা রূপের উপলব্ধি হত, কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। সুতরাং বিষয়ব্যবস্থা অনুসারে ইন্দ্রিয়ের পূর্বোক্ত ভেদ স্বীকার করতে হবে। এভাবে ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার পূর্বোক্ত সাংখ্যমতের খণ্ডন করে, সেই বিষয়ে স্বাভিমত ব্যক্ত করেছেন। যার দ্বারা সহজেই পাঠকের ন্যায় ও বৈশেষিকসম্মত ইন্দ্রিয়ের প্রকার বিষয়ে যথাযথ বোধ উৎপন্ন হবে।

ঘ. *তর্কভাষা*কার **অর্থ** নামক প্রমেয়ের বর্ণনাপ্রসঙ্গে ন্যায় ও বৈশেষিকের সমানতন্ত্রীয়তা প্রদর্শন করেছেন। সেখানে তিনি দ্রব্যাদি ছয়টি ভাবপদার্থ এবং সপ্তম পদার্থ অভাবের বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থকার পৃথিব্যাদি চারটি কার্য দ্রব্যের বর্ণনার পর ন্যায় ও বৈশেষিকসম্মত উৎপত্তি ও বিনাশ ক্রমের আলোচনা করেছেন। সেখানে গ্রন্থকার প্রথমে উৎপত্তির কথা বলেছেন। **আপত্তি হতে পারে,** প্রশস্তপাদার্য প্রথমে সংহার বা বিনাশের কথা বলে, তারপর উৎপত্তির কথা বলেছেন। তাহলে *তর্কভাষা*কার কেন প্রথমে উৎপত্তির কথা বললেন? এর উত্তর আমরা ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***তে পাই। সেখানে বলা হয়েছে যে, উৎপন্ন বস্তুরই বিনাশ হয়। অনুৎপন্ন বস্তুর কখনও বিনাশ হতে পারে না। তাই গ্রন্থকার প্রথমে উৎপত্তির কথা বলে, শেষে বিনাশের কথা বলেছেন। এক্ষেত্র টীকাকারের যুক্তিটি গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, বিনাশের পর নতুন সৃষ্টি হলেও সেই বিনাশ কিন্তু সৃষ্ট বস্তুরেই হয়।

ঙ. *তর্কভাষা*কার ধর্মাধর্মরূপ যাগাদি ক্রিয়াকে **প্রবৃত্তি** বলেছেন। তবে সেখানে তিনি উক্ত প্রবৃত্তির কোন প্রকার ভেদের কথা বলেননি। ***তর্কভাষাপ্রকাশ*** ও ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার *ন্যায়সূত্র*কারকে অনুসরণ করে জীবের শারীরিক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ প্রবৃত্তির কথা বলেছেন। কিন্তু ***সারমঞ্জরী***কার সেই বিষয়টি একটু ভিন্ন ভাবে বিশ্লেষণ করে, দৈনন্দিন জীবনে যে সকল প্রবৃত্তি হয়, সকল প্রকার প্রবৃত্তির কথাই বলেছেন। যেমন - যাগাদি বিষয়ক, চৌর্যাদি বিষয়ক, ভোজনাদি বিষয়ক, নিষ্ফল কর্মবিষয়ক প্রভৃতি। যেহেতু ইচ্ছা শক্তি বলবতী। তাই সকল প্রকার প্রবৃত্তির মূল হল ইচ্ছা। প্রসঙ্গত এই বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে, যেমন - গোবর-পোকা যদি প্রজাপতির সঙ্গ লাভ করত, তাহলে সে সেই সদ্‌-ইচ্ছাবশত গোবরের রস ছেড়ে ফুলের মধু সেবন করতে পারত। বাস্তবে সমাজের ক্ষেত্রে তা খুবই প্রাসঙ্গিক, মানুষ তার ইচ্ছাগুলোকে পরিবর্তন করলে, উন্নততর সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে।

চ. *তর্কভাষা*কারের মতে, মোক্ষ হল অপবর্গ। আর তা একুশ প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির দ্বারা হয়। সেই অপবর্গ লাভের উপায় প্রসঙ্গে বলেছেন - ন্যায়শাস্ত্রবেত্তা পুরুষ, যিনি সকল প্রকার তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করে, বিষয়সমূহের দোষ দর্শন করে, বিরক্ত হয়েছেন, সেই মুমুক্ষু যোগসমাধির দ্বারা একুশ প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির লাভ করেন। ***তর্কভাষাপ্রকাশ*** এবং ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***তে গ্রন্থকারোক্ত অপবর্গের স্বরূপ ও তা লাভের উপায় যথাযথ ব্যাখ্যাত হলেও, অপবর্গের কোন প্রকার লক্ষণ নিরূপিত হয়নি।

কিন্তু ***সারমঞ্জরী***তে স্বসমানাধিকরণ স্ব-অসমানকালীন দুঃখধ্বংস'কে মোক্ষ বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে - "মোক্ষং লক্ষযতি - মোক্ষ ইতি। স্বসমানাধিকরণস্বাসমান-কালীনদুঃখধ্বংসঃ।" এখানে **স্ব**-পদের দ্বারা দুঃখকে বুঝতে হবে। দুঃখের সমান অধিকরণ এবং দুঃখের অসমানকালীন দুঃখধ্বংসই মোক্ষ। 'ধ্বংসাভাব' মাত্রই মুক্তি নয়, কেননা, তাহলে ঘটাদির ধ্বংসকেও মোক্ষ বলতে হবে। তাই 'দুঃখধ্বংস' পদটির গ্রহণ হয়েছে। এরূপ সংসারকালীন দুঃখধ্বংসে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য সেই দুঃখধ্বংসের বিশেষণরূপে 'অসমানকালীনত্ব' পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। কারণ, সংসারদশায় প্রতিনিয়ত দুঃখের উৎপত্তি এবং বিনাশ হয়। পূর্বোক্ত একুশ প্রকার দুঃখের মধ্যে, যে সময় একটি দুঃখের ধ্বংস হয়, সেই সময় অন্য একটি দুঃখের উৎপত্তি হয়। অত এব 'সংসারকালীন দুঃখধ্বংস' দেবদত্তাদি আত্মাস্থিত অন্য দুঃখের সমকালীন। কিন্তু সেই দুঃখধ্বংসই মোক্ষ, যে দুঃখধ্বংস অন্য দুঃখের অসমানকালীন। আবার যদি কেবলমাত্র 'অসমানকালীনদুঃখধ্বংস'কে মোক্ষ বলা হয়, তাহলে মহাপ্রলয়ে জীবের সকল প্রকার দুঃখের ধ্বংস হওয়ায়, এবং ঐ দুঃখ অন্য কোন দুঃখের সমকালীন না হওয়ায়, তাতে মোক্ষের এরূপ লক্ষণটি অতিব্যাপ্ত হয়। কিন্তু মহাপ্রলয়ের পূর্বে দেবদত্তাদি আত্মাস্থিত দুঃখধ্বংস, যজ্ঞদত্তাদি আত্মাস্থিত দুঃখের সমকালীন। অত এব এক্ষেত্রে লক্ষণটি মোক্ষে প্রসক্ত হয় না। তাই লক্ষণে 'স্বসমানাধিকরণ' পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ দুঃখের সমান অধিকরণ এবং অসমকালীন দুঃখধ্বংসকেই মোক্ষ বলা হবে। সুতরাং দেবদত্তাদি দুঃখধ্বংস, যজ্ঞদত্তাদি দুঃখের সমকালীন হলেও সমান অধিকরণ না হওয়ায়, পূর্বোক্ত 'স্বসমানাধিকরণস্বাসমানকালীনদুঃখধ্বংস' - মোক্ষের এরূপ লক্ষণ করলে, তা সকল প্রকার দোষরহিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এরূপ নব্য নৈয়ায়িক বিশ্বনাথও অপবর্গসূত্রের ('তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ') বৃত্তিতে মোক্ষ বা অপবর্গের এরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

এভাবে অন্যান্য পদার্থের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গেও এই টীকাটিতে প্রায়শ নব্য ন্যায়ের শৈলী অনুসৃত হয়েছে। শৈলী অনুসারে *তর্কভাষা* প্রাচীন-ন্যায়ের গ্রন্থ হলেও ***সারমঞ্জরী***কারের এরূপ ব্যাখ্যানের ফলে পাঠক সহজে নব্য ন্যায়ের আঙ্গিকে পদার্থতত্ত্বের জ্ঞান লাভ করতে পারবে।

ছ. নির্বাচিত তিনটি টীকাতেই *তর্কভাষার* প্রতিটি পদের যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস লক্ষিত হয়। যেমন - স্থল-বিশেষে পরমত খণ্ডন করা হয়েছে। ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা*** নামক টীকাটিতে তার প্রবনতা একটু বেশী। আবার কোন কোন স্থলে পূর্বাচার্যদের কোন অনবদ্য আলোচনা গৃহীত হয়েছে। যেমন 'দোষ' নামক প্রমেয়ের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ***তর্কভাষাপ্রকাশ*** টীকাতে বলা হয়েছে - "প্রবৃত্তিজনকপ্রত্যক্ষাত্মবিশেষগুণত্বং সামান্যলক্ষণং হৃদি নিধায দোষান্বিভজতে। দোষা ইতি।" এরূপ প্রায় একই ভাবে ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***তে বলা হয়েছে - 'আত্মানং দূষযন্তীতি দোষা ইত্যর্থং হৃদি নিধাযাহ - দোষা ইতি।' অত এব, এক্ষেত্রে ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার পূর্ব টীকাকারকে অনুসরণ করে এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

আবার ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***তে প্রতিপাদিত দ্রব্যাদি পদার্থের লক্ষণ একটু ক্লিষ্ট প্রকৃতির। কিন্তু সেই তুলনায় ***সারমঞ্জরী*** বা ***তর্কভাষাপ্রকাশে*** একটু সহজ করে বলা হয়েছে। যেমন - ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার তেজ দ্রব্যের লক্ষণ করেছেন - 'তেজস্ত্বং নাম উষ্ণস্পর্শবদ-সমবেতত্বরহিতস্পর্শরহিতসমবেতত্বরহিতং জাতিঃ।' অর্থাৎ উষ্ণস্পর্শযুক্ত, তেজভিন্ন দ্রব্যত্ব রহিত, স্পর্শ (শীত-অনুষ্ণাশীতস্পর্শ) ভিন্ন গুণত্বরহিত জাতি হল তেজস্ত্ব। আর এই তেজস্ত্বের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হল তেজ। আবার ***সারমঞ্জরী***কার বলেছেন - 'তেজস্ত্বম্ উষ্ণস্পর্শ-সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকতযা সিদ্ধা জাতিঃ।' অর্থাৎ উষ্ণস্পর্শের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে তেজস্ত্ব জাতি সিদ্ধ হয়। আর এই তেজস্ত্ব জাতি বিশিষ্ট পদার্থই হল তেজ। উভয়েই তেজস্ত্ব জাতির দ্বারা লক্ষণ নিরূপণ করলেও *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*কারের লক্ষণটি একটু ক্লিষ্ট প্রকৃতির বলে মনে হয়। কিন্তু সেই তুলনায় *সারমঞ্জরী*কার একটু সরলভাবে বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছেন।

এরূপ তিনটি টীকারই ভাষা শৈলী ও ব্যাখ্যান শৈলীর মধ্যে পার্থক্য লক্ষিত হয়। যেমন-***তর্কভাষাপ্রকাশে*** 'অন্যে তু', 'অপরে তু', 'ইত্যপরে' - ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা পূর্বপক্ষের উপস্থাপনা করা হয়েছে। একই ভাবে ***সারমঞ্জরীতে*** 'কেচিত্তু' ইত্যাদির প্রয়োগ বেশী হয়েছে।

আবার ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***তে - 'ইতি সাংখ্যা', 'ইতি মীমাংসকা' ইত্যাদিভাবে বিরোধী মতের স্পষ্টত উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়।

এরূপ ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা*** এবং ***সারমঞ্জরী***তে নব্য ন্যায়ের **পারিভাষিক** শব্দের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কিন্তু ***তর্কভাষাপ্রকাশে*** তুলনামূলকভাবে তা স্বল্প পরিমাণে দৃষ্ট হয়। তবে ব্যাখ্যান শৈলীতে এরূপ পার্থক্য থাকলেও তিনটি টীকাতেই কেশবমিশ্রসম্মত প্রমেয় পদার্থগুলির স্বরূপ পরিস্ফুটনের উত্তম প্রয়াস লক্ষিত হয়। যার দ্বারা সহজেই জিজ্ঞাসু পাঠক এই নিবন্ধে প্রতিপাদিত বিষয়গুলি সম্যগ্-ভাবে বুঝতে পারবে। এরূপ তাদের পারিভাষিক শব্দজ্ঞান উৎপন্ন হবে।

কেশবমিশ্রসম্মত প্রমেয় পদার্থগুলি টীকাত্রয়ের আলোকে ক্রমবদ্ধরূপে নিবন্ধটিতে পর্যালোচিত হয়েছে। তাই আলোচ্য গবেষণানিবন্ধটি ন্যায়শাস্ত্রীয় বিষয়ানুসন্ধানী পাঠকের তত্ত্বজ্ঞানের জন্য উল্লেখযোগ্য সোপান হিসেবে বিবেচিত হবে - এরূপ আমার বিশ্বাস।

******

উল্লেখপঞ্জি :

[1] ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ৩৭১

[2] তদেব, পৃ. ৩৪৬

[3] H.I.L., পৃ. ১৪১

[4] তদেব, পৃ. ৪৫৫

[5]"প্রমাণপ্রমেযসংশযপ্রযোজনদৃষ্টান্তসিদ্ধান্তাবযবতর্কনির্ণযবাদজল্পবিতণ্ডাহেত্বাভাসচ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেযসাধিগমঃ।" - ন্যা. সূ. ১.১.১

[6] ন্যা. দ., সম্পা., ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০

[7] স. দ., সং., সম্পা. উমাশঙ্কর শর্মা, পৃ. ৩৯৪

[8] ন্যা. সূ., বৃ (ন্যা.সূ. ১.১.৯)

[9] ন্যা. দ., (ভাষ্য ও বৃত্তি সহ), সম্পা. আশুবোধ বিদ্যাভূষণ ও নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন, পৃ. ২০

[10] ভা. পরি., কা. ৫০

[11] ন্যা. দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৮

[12] ন্যা. দ. সম্পা. অনন্তলাল ঠাকুর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৭

[13] তদেব, পৃ. ৪১৪

[14] ভা. পরি., সম্পা. পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী, পৃ - ১৯৫

[15] ন্যা. দ., সম্পা. অনন্তলাল ঠাকুর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০৬

[16] ন্যা. ম., সম্পা. সূর্যনারায়ণ শুক্ল, প্রমেয় প্রকরণ, পৃ. ৫৪

[17] ন্যা. দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৭

[18] ন্যা. দ., সম্পা. অনন্তলাল ঠাকুর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৮

[19] তদেব, পৃ. ৪২৩

[20] তদেব, পৃ. ৪৩৬

[21] ন্যা. দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২১

[22] তদেব, পৃ. ৭০

[23] ন্যা. দ., সম্পা. অনন্তলাল ঠাকুর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৭

[24] বৃহদ্. উপ., মন্ত্র. ৪.৪.৩

[25] ন্যা. দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৯-২৩০

[26] ন্যা. দ., সম্পা. অনন্তলাল ঠাকুর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৯

[27] ন্যা. ম., সম্পা. সূর্যনারায়ণ শুক্ল, পৃ. ৭৪

[28] ন্যা. দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩১৪

[29] ন্যা. দ., সম্পা. অনন্তলাল ঠাকুর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬

[30] ন্যা. দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৩

[31] তত্রৈব

[32] ন্যা. ম., সম্পা. সূর্যনারায়ণ শুক্ল, প্রমেয় খণ্ড, পৃ. ৭৭

[33] ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ১৮১

[34] 'আত্মত্বসামান্যবান্ আত্মা।' - তত্রৈব

[35] তদেব, পৃ. ১৮৫

[36] তদেব, পৃ. ২১৫

[37] তদেব, পৃ. ২১৮

[38] তদেব, পৃ. ২৬০

[39] কা. ব. (*দিনকরী* ও *রামরুদ্রী* সহ) সম্পা. আত্মারাম শর্মা, পৃ. ১৩৯

[40] ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ৩০০

[41] তত্রৈব

[42] তদেব., পৃ. ৩০১

[43] প্র. পা. ভা., সম্পা. দীননাথ ত্রিপাঠী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৮

[44] ভা. পরি., সম্পা. পঞ্চাননশাস্ত্রী, পৃ. ৫১-৫২

[45] ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ৩০৭

[46] প্র. পা. ভা., সম্পা. দীননাথ ত্রিপাঠী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩০

[47] তদেব, পৃ. ৩৭-৩৮

[48] ভা. পরি., সম্পা. পঞ্চাননশাস্ত্রী, পৃ. ৬৯

[49] 'প্রতিযোগিজ্ঞানাধীনজ্ঞানোঽভাবঃ।' - স. প., সম্পা. তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃ. ২৬০

[50] ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ৩১৫

[51] তদেব, পৃ. ২০২

[52] ন্যা. সূ. ভা. ১.১.৯

[53] ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ২০২

[54] তদেব, পৃ. ২০৫

[55] তদেব, পৃ. ৩১৮

[56] তদেব, পৃ. ৩২৭

[57] তদেব, পৃ. ৩২৮

[58] তত্রৈব

[59] তত্রৈব

[60] তদেব, পৃ. ৩২৯

[61] তত্রৈব

[62] ত. ভা., সম্পা. এস্. আর্. আয়ার, ভূমিকা, পৃ. ৪১

[63] ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ১

[64] কি. ভা., পৃ. ১

[65] তদেব, পৃ. ১৮৪

[66] ত. ভা., সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি. কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২৬২

[67] https://en.wikipedia.org/wiki/Harihara_I

[68] https://en.wikipedia.org/wiki/Harihara_II

[69] ত. ভা., (*ন্যায়প্রদীপ* টীকা সহ), সম্পা. সুরেন্দ্র লাল গোস্বামী, পৃ. ১

[70] তদেব., পৃ. ১৮৫

[71] D.C.S.M., সম্পা. এম্. রঙ্গাচার্য, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৮২

[72] তদেব., পৃ. ৩০৮৩

[73] ত. ভা., (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. এস্. এম্. পরাঞ্জপে, ভূমিকা, পৃ. xxi

[74] D.C.S.M., সম্পা. এম্. রঙ্গাচার্য, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৭৭

[75] সা. ম., পৃ. ১১৩

[76] তদেব., ভূমিকা, পৃ. xxxiii

[77] পরা. উপ., মন্ত্র. ১৮.২১-২২

[78] H.I.L., পৃ. ৩৫৭

[79] তদেব, পৃ. ৩৭৩

[80] তদেব, পৃ. ৩৮১

[81] তদেব, পৃ. ৩৮৬

[82] তদেব., পৃ. ৩৯২

[83] তদেব, পৃ. ৩৯৩

[84] তদেব, পৃ. ৩৮৮

[85] তদেব, পৃ. ৩৯৬

[86] তদেব, পৃ. ৩৯৭

[87] ত. ভা., ম. কা.

[88] ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি. কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ৯৮

[89] তত্রৈব

[90] ‘সোঽযং পরমো ন্যায ইতি। এতেন বাদ-জল্প-বিতণ্ডাঃ প্রবর্তন্তে নাতোঽন্যথেতি’ - ন্যা. দ. সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯

[91] ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ৪

[92] ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ৩

[93] সা. ম., পৃ. ৬-৭

[94] ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ১২-১৩

[95] ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ১৯৯

[96] সা. ম., পৃ. ৭৬

[97] ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ৬৫

[98] তদেব, পৃ. ৬৩

[99] ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২০০

[100] সা. ম., পৃ. ৭৬

[101] ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ৬৬

[102] ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২০৪

[103] 'সমবাযেন দ্রব্যশূন্যম্।' সা. ম., পৃ. ৭৯

[104] ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ৬৭

[105] ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২০৫

[106] সা. ম., পৃ. ৮০

[107] ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২০৫

[108] সা. ম., পৃ. ৮৬

[109] ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২৫১

[110] তত্রৈব

[111]ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ-৮৫

[112] সা. ম., পৃ. ১১৩

[113] ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২৫৩

[114] তত্রৈব

[115] সা. ম., পৃ. ১১৪

[116] তত্রৈব

[117] ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ-৯০

[118] ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২৫৩

[119] সা. ম., পৃ. ১১৪

[120] ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ-৯০

[121] ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২৫৩

[122] সা. ম.,পৃ. ১১৪

[123] ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ৩২৯

[124] সা. ম., পৃ. ১১৪

[125] ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২৪৪

[126] ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ, ৯১

[127] সা. ম. পৃ. ১১৪

[128] তদেব, পৃ. ১১৫

অনুশীলিত গ্রন্থপঞ্জি :

বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী :-

- অন্নংভট্ট। *তর্কসংগ্রহ* । সম্পা. নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ।
- উদয়নাচার্য। *ন্যায়কুসুমাঞ্জলী* । সম্পা. মোহন ভট্টাচার্য। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্, ২০১৫।
- কেশবমিশ্র। *তর্কভাষা* (দ্বিতীয় খণ্ড)। সম্পা. গঙ্গাধর কর। কোলকাতা : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ২০১৪
- কেশবমিশ্র। *তর্কভাষা* (প্রথম খণ্ড)। সম্পা. গঙ্গাধর কর। কোলকাতা : মহাবোধী বুক এজেন্সী, ২০১৩
- জয়ন্তভট্ট। *ন্যায়মঞ্জরী* । সম্পা. পঞ্চানন তর্কবাগীশ, কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৯
- তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ। *ন্যায়দর্শন* (প্রথম খণ্ড)। কোলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্, ১৯৮১

- -,-। *ন্যায়দর্শন* (চতুর্থ খণ্ড)। কোলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্, ২০১৫
- -,-। *ন্যায়দর্শন* (তৃতীয় খণ্ড)। কোলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্, ২০১৭
- -,-। *ন্যায়দর্শন* (দ্বিতীয় খণ্ড)। কোলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্, ২০১৫
- তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ। *ন্যায়পরিচয়* । কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্, ২০০৬
- *প্রশস্তপাদভাষ্য* (দ্বিতীয় ভাগ)। সম্পা. দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম। কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৭
- *প্রশস্তপাদভাষ্য* (প্রথম ভাগ)। সম্পা. দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম। কলকাতা : দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণসংঘ, ২০১০
- বিশ্বনাথ। *ভাষাপরিচ্ছেদ* (*সিদ্ধান্তসুক্তাবলী* সহ)। সম্পা. পঞ্চানন শাস্ত্রী। কোলকাতা : মহাবোধী বুক এজেন্সি, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ।
- *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্* । সম্পা. স্বামী গম্ভীরানন্দ। কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৪
- *বৈশেষিকসূত্র।* সম্পা. অমিত ভট্টাচার্য। কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১২
- ভট্টাচার্য, মোহন ও দীনেশ চন্দ্র। *ভারতীয় দর্শন কোষ* (প্রাচীনন্যায় - নব্যন্যায়-বৈশেষিকদর্শন)। কলিকাতা : সংস্কৃত কলেজ, ১৯৫৮
- শাস্ত্রী পঞ্চানন। *চার্বাক দর্শন* । চব্বিশ পরগনা : শ্রী সাম্যব্রত চক্রবর্তী, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ।
- *সাংখ্য দর্শন* । সম্পা. দূর্গাচরণ সাংখ্যবোদান্ততীর্থ। কলিকাতা : সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ।
- সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু। *ভারতীয় দর্শন*। কলিকাতা : ব্যানার্জী পাবলিশার্স, প্রথম খণ্ড, ১৯৭৬
- -,-। *ভারতীয় দর্শন* । কলিকাতা : ব্যানার্জী পাবলিশার্স, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৭৬

সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী :–

- अन्नंभट्टः। तर्कसंग्रहः। सम्पा. कृष्णवल्लभाचार्यः। वारानसी : चौखम्बा-संस्कृत-सीरीज-अफिस, 2017
- उपाध्याय, वलदेव। *भारतीय-दर्शन-की-रूपरेखा*। वारानसी : चौखम्बा ओरियेण्टालिया, 1979।
- केशवमिश्रः। *तर्कभाषा* (न्यायप्रदीप-टीकया सहिता)। सम्पा. सुरेन्द्रलालागोस्वामी। वेनारस : मेडिक्याल-हल-प्रेस, 1901
- केशवमिश्रः। *तर्कभाषा* (गोवर्धनमिश्रकृता *तर्कभाषाप्रकाश*-टीकासहिता)। सम्पा. शिभम् महादेओ पराञ्जपे। दिल्ली : चोखम्बा-संस्कृत-प्रतिष्ठानम्, 2005

- केशवमिश्रः। *तर्कभाषा* (चिन्नंभट्टविरचिता *तर्कभाषाप्रकाशिका*-टीका युक्ता) । सम्पा. देवदत्त-रामकृष्ण-भण्डारकरः केदारनाथ-साहित्यभूषणश्च । पुना : भाण्डारकरप्राच्य-विद्यासंशोधन-मन्दिराधिकारिभिः प्रकाशिता, 1979
- केशवमिश्र । *तर्कभाषा* । सम्पा. बदरीनाथशुक्ल । दिल्ली : मोतीलाल-बनारसीदास, 2017
- जयन्तभट्टः। *न्यायमञ्जरी* । सम्पा. सूर्यनारायणशुक्लः। वाराणसी : चौखम्बा-संस्कृत-सीरीज-अफिस,1936
- ठाकुरः, अनन्तलालः। *न्यायदर्शनम्* (*न्यायचतुर्ग्रन्थिका* समलङ्कृता, प्रथमः खण्डः) । दारभाङ्गा : मिथिला-विद्यापिठः, 1967
- जगदीशतर्कालंकारः। *तर्कामृतम् ।* सम्पा. जीवनकृष्णतर्कतीर्थः। कलिकाता : एशियाटिक-सोसाइटि, 1974
- *न्यायदर्शनम्* (भाष्य-वृत्ति-सहितम्) । आशुबोध-विद्याभूषणः नित्यबोधविद्याभूषणश्च । कलिकाता : आशुबोध-विद्याभूषण-नित्यबोधविद्याभूषण-प्रकाशनम्, 1911
- *प्रशस्तपादभाष्यम्* (हिन्दीव्याख्या सहित) । सम्पा. ढुण्डिराजशास्त्री । वाराणसी : चौखम्बा-संस्कृत-प्रतिष्ठानम्, 2016
- माधवदेवः । *सारमञ्जरी* (*तर्कभाषा*श्रिता टीका) । सम्पा. तोताद्रि-देवनायक-मुरलीधरः। नवदेह्ली : राष्ट्रिय-संस्कृतसंस्थानम्, 2012
- माधवाचार्यः । *सर्वदर्शनसंग्रहः* । सम्पा. उमाशङ्करशर्मा । वाराणसी : चोखम्बा-विद्याभवनम्, 2016
- मानमेयोदयः। सम्पा. स्वामियोगीन्द्रानन्दः। चौखम्बा-विद्याभवनम्, 2017
- विश्वनाथः । *कारिकावली* । सम्पा. आत्मारामशर्मा । वारानसी : चौखम्बा-संस्कृत अकादमी, 2021
- शङ्करमिश्रः । *वैशेषिकसूत्रोपस्कारः* । सम्पा. ढुण्ढिराज-शास्त्री । वाराणसी : चौखम्बा प्रकाशन्म्, 2016
- शिवादित्यः । सप्तपदार्थी । सम्पा. तपनशङ्करभट्टाचार्य्यः । कोलकाता : संस्कृत-वुक-डिपो, 2012
- शिवादित्यः । सप्तपदार्थी । सम्पा. अमरेन्द्र-मोहन-भट्टाचार्यः। कलकाता : कलकाता संस्कृत-सीरीज, 1934
- सांख्यसूत्रम् । सम्पा. कुञ्जविहारी-तर्कसिद्धान्तः। मानभूम : स्वयं कृत प्रकाशना, 1325 वङ्गाब्दः।

ইংরেজি ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী :–

- *A descriptive catalogue of Sanskrit Manuscript* (Vol-xi). Ed. Narendra Chandra Vedantatirtha & Chintaharan Chakravarti. Calcutta: The Asiatic Society, 1957
- *A descriptive catalogue of the Sanskrit Manuscript* (Vol-iii). Ed. M. Rangacharya. Madras : Government Oriental Manuscript Library, 1910

● Ananmbhatta. *Tarkasamgraha*. Ed. A. B. Gajendragadkar & R. D. Karmarkar. Delhi : Chaukhalmba Sanskrit Pratishthan, 2018

● *Catalogue of Sanskrit and Prakrit Manuscripts* (Part-I). Ed. Pt. Ambalal P. Shah. Ahmedabad: L. D. Institute of Indology, 1963

● Dasgupta, Surendranath. *A History of Indian Philosophy* (Vol-1). Delhi : Surjeet Publications, 2017

● Keśvamiśra. Tarkabhāṣā. Ed. Ganganatha Jha. Delhi : Chaukhamba Sanskrit Pratishthan, 2005

● Keśvamiśra. Tarkabhāṣā. Ed. S.R. Iyer. Varanasi : Chaukhambha Orientalia, 1979.

● Maxmuller, K. *The six system of Indian Philosophy*. Varanasi : Chowkhamba Sanskrit series office, 2008.

● Mukhopadhyaya, Gobindagopal. *Tri-Lingual-Dictionary*. Kolkata : Sanskrit book depot, 2018.

● Sayvapalli, Radhakrishnan & Charles A, Moore. A Source book in Indian Philosophy. USA : Princeton, New Jersey Princeton University press, 1967.

● Sayvapalli, Radhakrishnan. Indian Philosophy (Vol.1). London : George Allen & Unwin ltd. 1923

● Vidyabhusana, S. C. *A History of Indian Logic* (Ancient, Mediaeval and Modern School). Calcutta : The Calcutta University, 1921.

****